রিক্ত ভারত

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

মূল্য—বাঁধাই বারো আনা, সাধারণ আট আনা

খাদি-প্রতিষ্ঠান—কলিকাতা
১৫, কলেজ স্কোয়ার হইতে
শ্রীহেমপ্রভা দাসগুপ্তা
কর্ত্তৃক প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ—২০০০, আষাঢ়—১৩৩৯

প্রিণ্টার—
শ্রীচারুভূষণ চৌধুরী
খাদি-প্রতিষ্ঠান প্রেস
সোদপুর, ২৪ পরগণা

রিক্ত ভারত

নিবেদন

‘বস্ত্র-শিল্পের হাতিয়ার’ ছাড়া এ গ্রন্থের আর সমস্ত প্রবন্ধই ‘রাষ্ট্রবাণী’তে প্রকাশিত হইয়াছিল। ‘বস্ত্র-শিল্পের হাতিয়ার’ প্রকাশিত হয় ১৩৩২ সালের ‘প্রবাসী’তে।

দেশের দুঃখ দূর করিতে হইলে তাহার ব্যথা কি—তাহার দুঃখ কোথায় সকলের আগে তাহাই জানা দরকার। ভারতবর্ষের এই দুঃখের কথা অনেক দরদী ইংরেজ যতখানি জানেন, অনেক শিক্ষিত ভারতবাসীও ততখানি জানেন না। তাই ইংরেজদের মন্তব্যই এ গ্রন্থের অনেকখানি স্থান গ্রহণ করিয়াছে। তাহা ছাড়া আরও একটা কারণে ইংরেজদের কথার উপর আমি বিশেষ জোর দিয়াছি। ভারতবর্ষ ইংরেজদের কাছেই পরাধীন। সুতরাং তাঁহাদের কথায় অত্যুক্তি না থাকার সম্ভাবনাই বেশী।

একটা জাতির যখন অধঃপতন হয় তখন তাহার এমনি দুর্দ্দশাই ঘটিয়া থাকে—তাহার মন এমনি অসাড় হইয়া পড়ে যে, তাহার নিজের দুঃখ যে কোথায় তাহাও সে ধরিতে পারে না, তাহাও ধরাইয়া দিতে হয় বিদেশীদের। কিন্তু সে যাহাই হোক্, বাহিরের লোক যাহা বলে তাহা শুনিয়াও যদি আমাদের শুভ-বুদ্ধি ফিরিয়া আসে তাহাও পরম লাভ। যে বেদনা-বোধ এই প্রবন্ধগুলি রচনায় আমাকে প্রেরণা দিয়াছিল, এ গ্রন্থ পড়িয়া দেশের লোকের মনে যদি তাহাই জাগ্রত হয়, আমার এ রচনা সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে করিব।

সোদপুর

আষাঢ়, ১৩৩৯

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

সূচীপত্র

প্রথম ভাগ

স্বাধীনতার প্রয়োজন ১
স্বরাজের পথে ১০
অংশীদারিত্বের দাবী ১৭
ব্রিটিশ ভারত ৩৯
ভারতের জাতীয় ঋণ ৪৬
শোষণের একটা দিক ৫২
কংগ্রেসের ইঙ্গিত ৫৮
সামরিক ব্যয় ৬৪
কমিটি ও কমিশন ৭০
ব্যাধি ও প্রতিকার ৮৩
সভ্যতার অভিশাপ ৮৮

দ্বিতীয় ভাগ

বস্ত্র-শিল্পের হাতিয়ার ৯৫
মস্‌লিনের কথা ১১৭
ইংরেজের স্বদেশী আন্দোলন ১২৪
বস্ত্র-শিল্পে ইংরেজের সংরক্ষণ নীতি ১৩২
বিভিন্ন দেশে চরকার স্থান ১৪২
ভারতবর্ষ ও কুটির-শিল্প ১৫৫

প্রথম ভাগ

স্বাধীনতার প্রয়োজন

দেশের পক্ষে, জাতির পক্ষে পরাধীনতার বাড়া অভিশাপ আর নাই। জাতি বুদ্ধিমান হইতে পারে, প্রতিভাশালী হইতে পারে, শক্তি এবং সামর্থ্যেও বড় হইতে পারে, কিন্তু পরাধীন হইলে এ সমস্ত গুণই তাহার চাপা পড়িয়া যায়। পরাধীনতার আবহাওয়ায় কোনো জাতিরই অন্তর্নিহিত শক্তি বিকাশ লাভের পথ পায় না। তাহার পর এই পরাধীনতা যদি তাহার দীর্ঘ দিন স্থায়ী হয় তবে তাহার ফল হয় আরও শোচনীয়। তখন সে এমন ভাবেই পঙ্গু হইয়া পড়ে যে, বিজেতার ব্যর্থ অনুকরণ ছাড়া তাহার আর কিছু করিবার শক্তিও থাকে না—পথও থাকে না।

যাঁহারা চিন্তাশীল মনীষী, যাঁহারা রাজনীতি বোঝেন, অথচ যাঁহাদের ভিতর উদারতা আছে এ সম্বন্ধে তাঁহাদিগকেও কখনো দ্বিমত হইতে দেখা যায় না। নজির স্বরূপ কয়েকজন বিখ্যাত রাজনীতি-বিশারদের মতের অনুবাদ নীচে দেওয়া গেল ঃ—

"আমি জোর করিয়াই বলিতে পারি যে, আদিম যুগ হইতে ইতিহাসে যে সব দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তাহার ভিতর এমন একটি দৃষ্টান্তও পাওয়া যায় না, যাহাতে তথাকথিত নিকৃষ্ট জাতি বা সম্প্রদায় পরাধীনতা বা অন্য জাতির অভিভাবকতার ভিতর দিয়া চরিত্রে উন্নত হইয়াছে, স্বাবলম্বী বা স্ব-শাসিত জাতিতে পরিণত হইয়াছে, অথবা উন্নতি বা স্বায়ত্ত-শাসনের পথে অগ্রসর হইয়াছে। কোনো রূপ ভুলের আশঙ্কা না করিয়াই

এ কথাও বলা যায় যে, একই জাতি বা একই রক্তের লোকের শাসনের প্রভাবও যে কোনো সম্প্রদায়কে হীন-বীর্য্য ও অধঃপতিত করিয়া ফেলে। যদি কেহ প্রমাণ চায় তবে আমি নিঃসংশয়েই প্রমাণ করিতে পারি যে, এ নিয়ম অব্যর্থ। মানুষের আদি ও চিরন্তন চরিত্র হইতেই দেখানো যায় যে, ইহার কোনো ব্যতিক্রম নাই—থাকিতেও পারে না। অসংখ্য উদাহরণের সাহায্যেই এ সত্য প্রমাণ করা যায়।"—Charles Francis Adams

"উদার স্বেচ্ছাচার-তন্ত্রের দ্বারাও কোনো রাজাকে শাসিত করিবার চেষ্টা করিলে যাহারা শাসিত তাহারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এরূপ রাজ্যের যাহারা প্রজা তাহারা কেবল আদেশই পালন করিতে শিখে, যে নাগরিক কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করে সেরূপ নাগরিকের মর্য্যাদা লাভ করিতে পারে না। তাহাদের সাহিত্য, তাহাদের শিল্প, তাহাদের আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তি নষ্ট হইয়া যায়। যাহারা কেবল নকল ও অনুকরণ করে ইহারা অধঃপতিত হইয়া তাহাদেরই পংক্তিতে আসিয়া দাঁড়ায়"—Ramsay Macdonald.

"যে সমস্ত কারণে একটা জাতি ধ্বংস হয় বিদেশী শাসনই তাহার প্রধানতম। * * * জাতির উন্নততর জীবনের বিকাশের পক্ষে বিদেশী শাসনের প্রভাব অতিমাত্রায় ক্ষতিকর।"—Prof. E, A, Ross.

কেবলমাত্র রাজনীতি-বিদ্‌দের বাণীতে নহে, দুনিয়ার ইতিহাসেও প্রত্যেক পরাধীন জাতির এই দশাই ঘটিতে দেখা যায়। সাহসে, শক্তিতে, বীর্য্যে, স্বাধীনতার মর্য্যাদা-বোধে আদিম যুগের ব্রিটনেরা কাহারো অপেক্ষা হীন ছিল না। পুনঃ পুনঃ আক্রমণের দ্বারা, বহু সৈন্য ধ্বংসের পর, বহুবার মার খাইয়া রোমানেরা ইংলণ্ডকে অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু

পরাধীনতার জোয়াল তাহাদের ঘাড়ে দৃঢ় হইয়া চাপিয়া বসার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ভিতর হইতে এই সব গুণের চিহ্নগুলিও অন্তর্হিত হইয়া যায়। রোমান-শাসনের আওতায় বাস করিয়া তাহারা একেবারে মেকি রোমানই বনিয়া গিয়াছিল। রোমানদের রীতি-নীতি, তাহাদের আদব-কায়দা, তাহাদের সমাজ ও ধর্ম্ম, তাহাদের সভ্যতার ধারা—এগুলি তাহাদের মনে যে মোহের সঞ্চার করিয়াছিল তাহার ফলে তাহাদের নিজেদের বৈশিষ্ট্য বা স্বাতন্ত্র্যের কিছুমাত্র আর তাহাদের ভিতর অবশিষ্ট ছিল না। এমনি করিয়া অত বড় একটা দুর্দ্ধর্ষ জাতি স্বাধীন হইবার আকাঙ্ক্ষাটাকেও হারাইয়া ফেলিয়াছিল। কথাটা যে এতটুকু অতিরঞ্জিত নহে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় রোমানদের ইংলণ্ড ত্যাগের পর। ইতিহাসের এই অংশটার কথা "The Ground Book of British History"তে নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে ঃ—

"ঘরের কাছের আক্রমণকারীদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত হওয়ায় দূরবর্ত্তী উপনিবেশ সমূহ হইতে রোমের সৈন্যদিগকে তুলিয়া আনার প্রয়োজন হয়। সুতরাং ৪১০ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট হনরিয়াস ব্রিটনদিগকে বলেন যে, অতঃপর তাহারা আর তাঁহার প্রজা নহে। ইহার পর হইতে ব্রিটনদের অভ্যুত্থান ও পতন তাহাদের নিজেদের উপরেই নির্ভর করিতে থাকে। কিন্তু নিজের পায়ে নির্ভর করিয়া দাঁড়াইবার শক্তি তখন আর তাহাদের ছিল না। সভ্যতার দ্বারা তাহারা একটি শান্ত শিষ্ট সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছিল বটে, কিন্তু জাতিরূপে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। তাহারা রোমানদের অভ্যাসের অনুকরণ করিয়াছিল, রোমানদের বেশ-ভূষা গ্রহণ করিয়াছিল, বিজেতাদের ভাষায় কথা বলিত, রোমের আদর্শে প্রস্তুত বাড়ীতে বাস

করিত, রোমান স্নানাগারে স্নান করিত, কিন্তু যে সব গুণ রোমানদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছিল তাহা তাহারা অর্জন করিতে পারে নাই। শান্তিতে থাকিয়া তাহারা বিষয়-সম্পত্তির উপর অনুরক্ত হইয়াছিল, কিন্তু সবল ও সশস্ত্র মানুষই যে তাহা রক্ষা করিয়া চলিতে পারে—সে শিক্ষা তাহাদের ছিল না। রোমের শক্তির উপর নির্ভর করিতে করিতে তাহারা অবশেষে সেই তেজ ও স্বাধীনতার স্পৃহাকেই হারাইয়া ফেলিয়াছিল যাহা 'বোডেশিয়া' এবং 'কারেকটেকাস'কে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছিল। সুতরাং যে শক্তি প্রথমে তাহাদিগকে বশ মানাইয়া তারপর তাহাদের রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিল সেই শক্তি যখন তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া গেল, তখন যে দুর্দ্ধর্ব আক্রমণকারীরা পশ্চিম হইতে আক্রমণ সুরু করিয়াছিল তাহাদের কাছে পরাজয় স্বীকার করা ছাড়া আর তাহাদের কোনো গত্যন্তরই ছিল না।—British History—by Warner & Marten.

ইতিহাস হইতে আরও অনেক দৃষ্টান্ত এমনি করিয়া আহরণ করিয়া দেওয়া যায়। কিন্তু দূরের ইতিহাসের দিকে তাকাইবার প্রয়োজনই বা কি আছে? ভারতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। অপ্রমেয় শক্তি, স্বাধীনতার প্রতি অপরিসীম ভালবাসা, মৃত্যুকে তুচ্ছ করিবার স্পর্দ্ধা—এ সমস্তের দৃষ্টান্তে ভারতের ইতিহাস পরিপূর্ণ। রাজপুত, শিখ বা মারাঠাদের ইতিহাস এই মৃত্যুজয়ী বীরত্ব ও দেশাত্মবোধেরই ইতিহাস। সেদিনও ইংরেজ যখন ভারতবর্ষকে অধিকার করে, ভারতবর্ষের শক্তির পরিচয় তাহারাও লাভ করিয়াছিল। ভারতবর্ষের অধিকার তাহাদের পক্ষেও সহজ উপায়ে ঘটে নাই। রক্তের

ধারায় মাটি ভিজাইয়া, সহস্র সহস্র লোকের জীবন বলি দিয়াই ভারতের এই স্বাধীনতাকে তাহারা হরণ করিয়াছিল। ভারত বিজয়ের এই অংশটির কথা বলিতে গিয়া মিঃ Dickinson লিখিয়াছেন :—"ওয়াটার্লু যুদ্ধেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী রক্তপাত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। কিন্তু ভারতবর্ষ জয়ের ব্যাপারে কোনো কোনো যুদ্ধে যে রক্ত ক্ষয় হইয়াছে তাহা ওয়াটার্লুর ক্ষতির প্রায় দ্বিগুণ। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে সাটলেজের যুদ্ধে যে ক্ষতি হইয়াছে তাহাও ওয়াটার্লুর যুদ্ধের ক্ষতি অপেক্ষা বহুগুণে বেশী।"

অথচ দেড়শত বৎসর মাত্র ইংরেজের শাসনাধীনে থাকিয়া ভারতবর্ষ আজ এমন অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে, বল-বীর্য্যের কোনো পরিচয়ই আর তাহার ভিতর পাওয়া যায় না। কেবল মাত্র রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে নহে, জাতির মন এবং বৈদগ্ধ্যের দিক দিয়া এই পরাধীনতার পরিণাম যাহা হইয়াছে তাহা আরও শোচনীয়—আরও গ্লানিকর। ভারতবর্ষের সভ্যতার এমনি একটা অসাধারণত্ব ছিল যে, সেই সভ্যতার কথা বলিতে গিয়াই লর্ড কার্জ্জন বলিয়াছিলেন—"ইংরেজেরা যখন দেহ চিত্রিত করিয়া বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইত এবং ব্রিটিশ উপনিবেশগুলি জন-শূন্য প্রান্তর এবং জঙ্গলমাত্র ছিল তখনও ভরতবর্ষে শক্তিশালী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইতিহাস, দর্শন ও মানবতার ধর্ম্ম সম্পর্কে ভারতবর্ষ যে বৈশিষ্ট্যের ছাপ রাখিয়া গিয়াছে পৃথিবীর আর কোনো জাতিই তাহা পারে নাই।"

এইরূপ একটি অনন্যসাধারণ সভ্যতার আদর্শ যাহার সমাজের সঙ্গে ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত ছিল, মানবতার অভূতপূর্ব্ব বিকাশ যাহার জীবনের ধারাকে একটি অভিনব বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছিল, শিক্ষার দিক দিয়া, জ্ঞানের দিক দিয়া, ধর্ম্ম এবং কর্ম্মের দিক দিয়া সমস্ত জগত একদিন

যাহার অনুসরণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে, স্বাধীনতা হারাইয়া সেই ভারত আজ এমন একটা জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে, সেদিনও যাহারা অসভ্য বলিয়া খ্যাত ছিল তাহারাও আজ ভারতের পানে অনুকম্পার দৃষ্টিতে তাকায়, তাহাকে অসভ্য, অক্ষম, কাপুরুষ বলিয়াই মনে করে। বিশ্বের সমাজে সে আজ অপাংক্তেয়—অস্পৃশ্য। বস্তুতঃ তাহার সে যুগের উন্নতি যেমন অতুলনীয় তাহার এ যুগের যে অধঃপতন তাহারও তেমনি তুলনা নাই। নিজের অতীতকে সে বিস্মৃত হইয়াছে, তাহার নিজের ভাণ্ডারে যে অফুরন্ত সম্পদ রহিয়াছে তাহাকে পরিহার করিয়া সে মাতিয়া উঠিয়াছে পাশ্চাত্য জগতের ব্যর্থ অনুকরণে। অমৃত সমুদ্রের উপকূলে বসিয়া সে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে উচ্ছল মদ্যের ফেনায়িত তরঙ্গের দিকে। আজ সে মনে করিতেছে—ইউরোপীয় সভ্যতার ভিতর যে পঙ্কিল ভোগ-ধারা আছে তাহাতেই অবগাহন করিতে না পারিলে তাহার মুক্তি নাই। পরাধীনতা মানুষকে যে কতখানি আত্ম-বিস্মৃত করিয়া তোলে, জাতির জীবনে যে কত বড় অধঃপতন আনিয়া দেয়, বর্ত্তমান ভারতের দিকে তাকাইলে তাহার নিঃসংশয় পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং পরাধীনতা জাতির পক্ষে যে চরমতম অভিশাপ তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই।

কিন্তু ভারতবর্ষের সম্বন্ধে ইংলণ্ডের রাষ্ট্র-নায়কেরা অবশ্য সেকথা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন—স্বাধীনতা চাওয়া আমাদের পক্ষে একটা প্রকাণ্ড বেইমানী মাত্র। কারণ তাঁহারা আমাদিগকে শান্তি দিয়াছেন, সুখ দিয়াছেন, বড় বড় রাস্তা-ঘাট দিয়াছেন, রেল-ষ্টিমার দিয়াছেন, ব্যবসা-বাণিজ্য দিয়াছেন, কল-কারখানা, দালান-ইমারৎ দিয়াছেন, নূতনতর সভ্যতার অনুপ্রেরণা দিয়াছেন। তাঁহারা না আসিলে এগুলি লাভ করা

কোনো প্রকারেই আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইত না এবং তাঁহারা চলিয়া গেলেও এগুলি বজায় রাখা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

ইংরেজ ভারতবর্ষকে যাহা দিয়াছে তাহার কতটা ভালো আর কতটা মন্দ তাহা লইয়া দ্বন্দ্বের অন্ত নাই। কিন্তু এ দ্বন্দ্ব না থাকিলেও যেহেতু পরাধীন সেই হেতুই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা চাওয়ার প্রয়োজন ছিল এবং এখনও আছে। পরাধীনতা মানুষকে যে ক্লৈব্য দান করে, যে ভাবে তাহাকে সুস্থ সবল মনুষ্যত্ব হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখে তাহা সকল জাতির সকল মানুষের পক্ষেই গ্লানিকর, হানিকর ও অপমানকর। আর সেই জন্যই স্বাধীনতার প্রয়োজন সকল মানুষের পক্ষেই অপরিহার্য্য এবং প্রত্যেক জাতিরই তাহা লাভেরও অকুণ্ঠিত অধিকার আছে।

বস্তুতঃ এই যে পরোপকারের কৈফিয়ৎ, ইহা বিজেতাদের চিরকালের কৈফিয়ৎ। এ কৈফিয়ৎ বিজেতা মাত্রেই বিজিতদিগকে অধীনে রাখিবার জন্য জগতের সেই আদিম যুগ হইতে দেখাইয়া আসিতেছে। এই কৈফিয়তের সম্বন্ধেই এব্রাহাম লিঙ্কন লিখিয়াছেন:—"পৃথিবীর সমস্ত যুগেই যাহারা অত্যাচারী তাহারা এই কথা বলিয়াই অন্য জাতিকে জয় করে এবং দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখে যে, বিজিত জাতির কল্যাণের জন্যই তাহারা এরূপ করিতেছে। অন্য একটি জাতিকে পরাধীন করিয়া রাখিবার যুক্তি-স্বরূপ এ উক্তি একজন রাজার মুখ দিয়াই বাহির হোক্, বা অন্য কোনো জাতির কোনো লোকের মুখ দিয়াই বাহির হোক্, যেদিক দিয়াই বিচার করিয়া দেখা যায়, প্রকৃতিতে তাহা সেই চির পুরাতন সর্পেরই অনুরূপ। তাহারা সকলেই বলে—তাহারা যে অন্য লোকের গলায় বন্ধন রজ্জু জড়াইয়া দিয়াছে তাহার কারণ ইহা নহে যে, তাহার

ইহাই চায়—তাহার কারণ ইহার দ্বারা সেই সকল লোকের অবস্থারই উন্নতি সাধিত হয়।”

ভারতবর্ষের অধঃপতন যে হইয়াছে—এ কথা কেহই অস্বীকার করে না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও অস্বীকার করিবার জো নাই যে, এ অধঃপতনের জন্য দায়ী ভারতবর্ষ নিজে নহে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে তাহার পরাধীনতার ভিতরেই তাহাকে খুঁজিতে হইবে। জাতি যত বড়ই হোক্ না কেন, পরাধীনতার ভিতর থাকিলে এ ক্লেদ তাহার ভিতর না জন্মিয়াই পারে না। ইংলণ্ডকেও যদি এই অবস্থায় পড়িতে হইত তবে এ গ্লানির হাত হইতে সেও কোনোরূপে মুক্তি লাভ করিতে পারিত না—চিন্তাশীল ইংরেজেরাও একথাটা স্বীকার করেন। তাই Sir Thomas Munro বলিয়াছেন—“Let Britain be subjugated by a foreign power to-morrow; let the people be excluded from all share in the government, from public honors, from every office of high trust and emoluments and let them in every situation be considered as unworthy of trust and all their knowledge, and all their leterature, Sacred and profane, would not save them from becoming in a generation or two a low-minded, deceitful and dishonest race. অর্থাৎ কাল যদি ব্রিটেন বিদেশী শক্তির কাছে পরাজিত হয়, তাহার জন-সাধারণকে যদি শাসন-তন্ত্রের সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয়, যদি সম্মান হইতে, উচ্চ ও দায়িত্ব-পূর্ণ পদ হইতে তাহাদিগকে বাদ

দেওয়া হয়, যদি প্রত্যেক অবস্থায় তাহাদিগকে বিশ্বাসের অনুপযুক্ত বলিয়া মনে করা হয়, তবে তাহাদের সমস্ত জ্ঞান, তাহাদের সাহিত্য, তাহাদের কোনো কিছুই তাহাদিগকে অধঃপতন হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। এক বা দুই পুরুষের ভিতরেই তাহারা হীন-চেতা, অসাধু ও প্রতারণা-পূর্ণ জাতিতে পরিণত হইবে।

ইংরেজ স্বাধীন জাতি। সুতরাং স্বাধীনতার মর্ম্ম-কথা তাহাদের এতটুকুও অজানা নাই—থাকিতেও পারে না। বস্তুতঃ ভারতের দুঃখের উৎস যে কোথায় প্রত্যেক ইংরেজই তাহা জানে। তবু তাহারা সত্য কথা যে স্বীকার করে না তাহার কারণ তাহাদের নিজেদের স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই নহে। কিন্তু ইংরেজেরা স্বীকার করুক আর না-ই করুক, ভারতবর্ষের নিজের ভিতরে এ জ্ঞান সুস্পষ্ট হইয়া উঠা প্রয়োজন যে, সে পরাধীন; তাহার জানা আবশ্যক যে, তাহার সমস্ত দুঃখের যাহা মূল কারণ তাহাও ঐ পরাধীনতাই। মুক্তির পথের সন্ধান লাভ করিতে হইলে এই কথাটা তাহাদের অন্তর দিয়াই অনুভব করা দরকার।

স্বরাজের পথে

পরাধীনতা—ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক

ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেক মানুষের চলা-ফেরার ও কাজ-কর্ম্মের স্বাধীনতা আছে। এই স্বাধীনতাই আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে মধুময় করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু বাহিরের একজন আসিয়া যদি আমাদের এই স্বাধীনতা হরণ করে, চলিতে ফিরিতে সে যদি আমাদের কাজের সীমা নির্দ্দেশ করিতে থাকে, যদি বলে—ইহার সহিত কথা বলিতে পারো, উহার সঙ্গে কথা বলিও না, যদি বলে—রামের বাড়ীতে যাও আপত্তি নাই, কিন্তু শ্যাম তোমার বাড়ীতে আসিতে পারিবে না, যদি আমাদের কাজ-কর্ম্মের উপর লক্ষ্য রাখিবার জন্য আমাদের ঘরে বসিয়াই আমাদের উপর গোয়েন্দা বসায়, তবে জীবন-ধারণই দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। তাহার উদ্দেশ্য ভালো হইলেও তাহাকে সহ্য করা যায় না।

ব্যক্তিগত জীবনের পক্ষে যাহা সত্য, জাতীয় জীবনের পক্ষেও তাহাই সত্য। জাতির নিজেরই ঠিক করিবার অধিকার থাকা দরকার—সে কি করিবে, কি করিবে না, কোন্ পথ তাহার কল্যাণের পরিপন্থী, কোন্ শিল্প সে গ্রহণ করিবে, কোন্ শিল্প তাহার বর্জ্জন করিয়া চলা সঙ্গত। এই জন্যই এব্রাহাম লিন্‌কন বলিয়াছেন—"No man is good enough to rule another man, and no nation is good enough to rule another nation. For a man to rule himself is

liberty; for a nation to rule itself is liberty. But for either to rule another is tyranny." অর্থাৎ কোনো মানুষই অন্য আর একজনকে শাসন করিবার উপযুক্ত নহে, এবং কোনো জাতি অন্য আর একটি জাতিকে শাসন করিবার উপযুক্ত নহে। কোনো মানুষ যখন আপনাকে পরিচালিত করে তখনই সে স্বাধীন, এবং কোনো জাতির যখন নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করিবার অধিকার থাকে তখনই সেও স্বাধীন। ইহা ছাড়া একে যদি অন্যকে শাসন করে তবে তাহারই নাম উৎপীড়ন।

ভারতবর্ষ যদি ভারতবাসীদের হয় তবে সেখানে তাহাদের চলা-ফেরারও স্বাধীনতা থাকা দরকার। এই স্বাধীনতার পথ যদি বন্ধ হয় তবে জাতীয় জীবন বিষাক্ত হইয়া উঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার কল্যাণের পথও রুদ্ধ হইয়া যায়। ভারতবর্ষের চলা-ফেরার স্বাধীনতা না থাকায় তাহার বিকাশের পথও রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, রাজনৈতিক পরাধীনতা এবং ব্যক্তিগত পরাধীনতা এ উভয় দুঃখই যদি সমান হয়, তবে একটাতেই বা এত আঘাত লাগে কেন, আর একটার আঘাতই বা আমরা অনুভব করিতে পারি না কেন? যাহারা স্বাধীন জাত পরাধীনতার দুঃখ ব্যক্তিগত অধীনতার দুঃখ হইতেও তাহাদিগকে বেশী জোরে ঘা দেয়। কিন্তু আমাদের ঘাড়ে পরাধীনতার জোয়াল দীর্ঘকাল চাপিয়া আছে বলিয়াই হয়তো ইহার দুঃসহ দুঃখ আমরা তেমন তীব্রভাবে অনুভব করিতে পারি না। হয়তো বা আমাদের বোধ-শক্তিতেই খানিকটা মরিচা ধরিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও ইহা যে দুঃসহ দুঃখ তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। এত বড় দুঃখের সম্বন্ধেও যে

আমরা উদাসীন হইয়া থাকি তাহার দ্বারাও ইহার শোচনীয় পরিণামের কথাটাই ধরা পড়ে।

আরো একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে—এ আঘাত যদি এতকাল সহ্য করিয়াই আসিয়া থাকি, তবে আজই বা তাহার বিরুদ্ধে সচেতন হইয়া উঠিবার কারণ কি? ইহার কারণ সম্ভবতঃ ব্রিটিশ-আমলাতন্ত্রের অভিভাবকত্বের ভিতর যে মৃদু ভদ্রতার আবরণ ছিল সে আবরণটাও আজ খসিয়া পড়িয়াছে—তাঁহাদের অভিভাবকত্বের পিছনে যে অপমানের রূঢ়তা আছে তাহাই উগ্র হইয়া উঠিয়া আজ জাতির মর্ম্ম-দেশকে ঘা দিতে সুরু করিয়াছে। ইহার ছোট খাট রকমের দৃষ্টান্ত তো অজস্র আছেই, বড় দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। সুতরাং দেশের পরাধীনতা আজ যে কোন অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, এই সব ব্যাপারের ভিতর দিয়া তাহার চেহারাটাও দেশের লোকের কাছে স্পষ্ট হইয়া ধরা পড়িয়াই তাহাদিগকে আজ এসম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিতেছে। অবশ্য যাঁহারা চিন্তাশীল ব্যক্তি এই দুঃখের অনুভূতি পূর্ব্বেই তাঁহাদের মনে সাড়া জাগাইয়াছিল। বর্ত্তমান আঘাতগুলি সাড়া জাগাইতেছে জন-সাধারণের মনে।

পর-শাসন ও স্বায়ত্ত-শাসন

ভারতবর্ষের আজ যাঁহারা অভিভাবক, দমননীতি সম্বন্ধে তাঁহাদের কৈফিয়ৎ সুস্পষ্ট। যে আদর্শের দোহাই দিয়া দুরন্ত বালককে বেতের জোরে সায়েস্তা করিবার চেষ্টা করা হয়, সেই আদর্শের প্রেরণাতেই তাঁহারা দমননীতির পথ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের স্বার্থ নাই, ভারতের কল্যাণই তাঁহাদের একমাত্র কাম্য—এ কথা বলিতেও তাঁহারা দ্বিধা করেন

না এবং ভারতের নাবালকত্ব ঘুচিলেই এ নীতি অবলম্বনের আর প্রয়োজন হইবে না—এ কথাও তাঁহারা অতি সহজ সুরেই বলেন। কিন্তু মুখে এ কথা বলিলেও, এ নাবালকত্ব কোনো কালেই যে তাঁহারা স্বেচ্ছায় ঘুচিতে দিবেন—তাহারও সম্ভাবনা নাই। এ সম্বন্ধে ইংলণ্ডের লর্ড চ্যান্সেলারের উক্তি প্রমাণ্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন—"India is an incalculable asset to the mother Country. Great Britain has drawn from India large quantities of food staffs and raw materials essential to her industries. * * * In the fabric of the British Empire India is a vital part. Unless, indeed, we are content to abandon the great heritage of the past and sink into political and commercial insignificance, the surrender of india would be an act not only of folly but of degenerate paltroonery." অর্থাৎ মাতৃভূমির পক্ষে ভারতবর্ষ অমূল্য সম্পদ। গ্রেট ব্রিটেন সর্ব্বদা ভারতবর্ষ হইতে খাদ্যদ্রব্য ও কাঁচামালের সরবরাহ প্রচুর পরিমাণে লাভ করিতেছে। ভারতবর্ষের এই কাঁচামাল তাহার বাণিজ্যের পক্ষে একান্ত ভাবেই অপরিহার্য্য। * * * ভারতবর্ষ ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য-সৌধের একটি প্রধান অংশ। আমরা যদি অতীতের উত্তরাধিকার সূত্রে লব্ধ সম্পদের একটা বড় অংশ হইতে বঞ্চিত হইতে না চাই, যদি রাজনৈতিক এবং ব্যবসা-সংক্রান্ত ব্যাপারে নগণ্য হইয়া পড়িবার ইচ্ছা আমাদের না থাকে, তবে ভারতবর্ষকে আমরা ত্যাগ করিতে পারিব না। ভারতবর্ষকে

ত্যাগ করা আমাদের পক্ষে কেবলমাত্র নির্ব্বুদ্ধিতারই কাজ হইবে না, এরূপ পরিকল্পনা আমাদের পক্ষে হেয় কাপুরুষতারও পরিচায়ক।

ইঁহাদেরই অনেকে আবার ভারতে তাঁহাদের সুশাসনেরও গর্ব্ব করেন, বলেন—"The foundation of our empire in India rests on the principles of justice, and England retains its supremacy in India mainly by justice." (Sir Robert Fulton) অর্থাৎ ন্যায়ের নীতির উপরেই ভারতবর্ষে আমাদের সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত এবং প্রধানতঃ এই ন্যায়ের বলেই ইংলণ্ড ভারতবর্ষে তাহার প্রাধান্য বজায় রাখিয়া আসিতেছে।

এই ন্যায়ের প্রকৃত রূপ যে কি সে সম্বন্ধে কোনো বিচার-আলোচনা না করিয়াও বলা যায় যে, পর-শাসিত রাজ্য যদি সুশাসিতও হয় তবে তাহাও শাসিতের পক্ষে কল্যাণকর হইতে পারে না। সেই জন্যই যাঁহারা সত্যকার রাজনৈতিক ভাবের ভাবুক তাঁহারা বলেন—"Good government is no substitute for self government. The atmosphere of subjection is poisonous, killing all that is virile and worthy and fostering all that is vile and ignoble." (Sir Henry Campbell Bannerman) অর্থাৎ সুশাসন কখনও স্বায়ত্ত-শাসনের স্থান গ্রহণ করিতে পারে না। পরাধীনতার আবহাওয়াই বিষাক্ত। সে আবহাওয়ায় যাহা কিছু সবল ও মহৎ তাহাই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, যাহা কিছু খারাপ ও গ্লানিকর তাহাই বাড়িয়া উঠে।

সংযম ও অহিংসা

আমরা সু-শাসিতই হই আর কু-শাসিতই হই সেটা খুব বড় কথা নহে, বড় কথা এই যে, আমরা পরের দ্বারা শাসিত এবং পর-শাসিত বলিয়াই এই শাসনের হাত হইতে আমাদের মুক্তি লাভ করা আবশ্যক। পর-শাসন পরিহার্য্য একথা যদি সত্য হয়, তবে ইহাও সত্য যে, যত সত্বর এই দুঃখের হাত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারা যায় তাহাই মঙ্গল। সুতরাং ভারতবর্ষের মুক্তির জন্য যে চেষ্টা চলিতেছে তাহা যে ব্রিটিশ-বিদ্বেষের পরিচায়ক—তাহাও নহে।

ইংরেজের কাছে স্বাধীনতা চাহিতে গেলে তাহারা আমাদের অযোগ্যতার দোহাই দেয়, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের অজুহাত দেখায়, ব্রিটিশ শাসনের উপকারিতা ফিরিস্তি খুলিয়া বসে। তাহাদের পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক। অবশ্য এরূপ ইংরেজও দুই চারিজন আছেন যাঁহারা স্পষ্টই স্বীকার করেন—"The government of India is too wooden, too iron, too inelastic, too antideluvian, to be of any use for modern purposes. The Indian government is indefensible" (ভারতবর্ষের শাসন-পদ্ধতি এত আড়ষ্ট ও প্রাণহীন যে তাহার দ্বারা আধুনিক কোনো উদ্দেশ্যই সাধিত হইতে পারে না। এ শাসন-পদ্ধতিকে কোনো প্রকারেই সমর্থন করা যায় না—Right Hon'ble S. Edwin Montague) যাঁহারা বলেন—"Who says the people of India are not fit for home rule ?—We, English, who profit by ruling them, we who do not want to surrender power ; who in our egotism think we are the best and

ablest rulers in world" (Reverend John Page Hopps) অর্থাৎ ভারতবাসীরা স্বায়ত্ত-শাসনের উপযুক্ত নহে একথা কেবল আমরা ইংরেজেরাই বলি। কারণ তাহাদের শাসন করিয়া আমাদের লাভ আছে, কারণ আমরা ক্ষমতাকে পরিহার করিতে চাই না, কারণ আত্মাভিমান বশে আমরা মনে করি—পৃথিবীতে আমাদের তুল্য শাসক আর নাই। কিন্তু ইঁহাদের সংখ্যা যে সত্য সত্যই দুই চারিজন তাহাও নিঃসঙ্কোচেই বলা যায়।

সুতরাং অধিকার যদি কিছু লাভ করিতেই হয় তবে তাহা লাভ করিতে হইবে আমাদের নিজেদের শক্তিতে,—নিজেদের চেষ্টায়। একথা আজ কিছুতেই অস্বীকার করা চলে না যে, দেশের সম্মুখে একটা কঠোর পরীক্ষার দিন ঘনাইয়া আসিতেছে এবং ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, এ পরীক্ষায় আমরা ততখানিই সাফল্য লাভ করিব যতখানি ধীরতা এবং সংযমকে আমরা অবলম্বন করিতে পারিব, যতখানি অহিংসা অথচ নির্ভীকতার সঙ্গে আমরা কাজ করিতে পারিব! অত্যাচারের উত্তর অত্যাচারের দ্বারা দেওয়ার একটা প্রলোভন আছে। দেশ সে প্রলোভন প্রলুব্ধ না হয়—এ কথাটাও খুব বড় কথা। আমাদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের আকাঙ্ক্ষা যেমন অকৃত্রিম হওয়া দরকার, তাহার পথ সম্পূর্ণ প্রেমের পথ হওয়ার—অহিংসার পথ হওয়ার প্রয়োজনও তাহা অপেক্ষা কিছু মাত্র কম নহে।

অংশীদারিত্বের দাবী

ইংরেজকে প্রায়ই বলিতে শোনা যায়—বর্ত্তমান ভারতবর্ষ তাঁহাদের হাতে গড়া ভারতবর্ষ। সুতরাং ইহাকে হাত-ছাড়া করা যায় না। "The India of to-day is British India, * * * It is a partnership and the terms of the partnership cannot be varied by either party at will." অর্থাৎ আজিকার এই যে ভারতবর্ষ—এ তো ব্রিটিশ ভারতবর্ষ। ইংরাজেরা ইহার অংশীদার এবং যৌথ সম্পত্তির ব্যবস্থা একজন অংশীদারের ইচ্ছা অনুসারে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। সাদা কথায় ইহারই অর্থ দাড়ায়—'তোমরা স্বায়ত্তশাসনই চাও আর স্বাধীনতাই চাও তোমাদের ইচ্ছা অনুসারে তাহা দেওয়া হইবে না। ইংরেজেরা যখন যেরূপ মনে করিবে, অনুগ্রহের ক্ষুদকুড়া স্বরূপ তাহাই তোমাদিগকে দান করিবে।'

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যে কাহারও হাত হইতে অনুগ্রহের দানরূপে আসিবে না, তাহা জানি এবং একথাও জানি যে, বর্ত্তমান ভারতবর্ষ ইংরেজদের হাতে গড়া বলিয়া যে কথাটা বলা হয় তাহার ভিতরেও খানিকটা সত্য আছে। কিন্তু সত্য থাকিলেও সেজন্য ইংরেজদের স্পর্দ্ধা করিবার কিছুই নাই। কারণ তাহাদের সহযোগিতায় যে ভারত গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাতে ভারতবর্ষের সুখও বাড়ে নাই—গৌরবও বাড়ে নাই। বরং তাহাদের হাতে আসার পর হইতে তাহার দুঃখের পান-পাত্রই পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

অনশন ও দুর্ভিক্ষ, অপমান ও গ্লানিই আজ তাহার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। যেখানে অফুরন্ত আলোকের প্রবাহ ছিল, সেখানকার আলোক যদি কেহ নিবাইয়া দেয়, তবে সেজন্য তাহার স্পর্দ্ধা করিবার কিছু থাকে না।

ভারতবর্ষের সম্পর্কে বিগত দুইশত বৎসরের যে কোনো সময়ের ইতিহাস আলোচনা করিলে কথাটার তাৎপর্য্য আরো ভাল করিয়া বোঝা যায়। প্রথমে ভারতবর্ষের দৈন্যের কথাটাই ধরা যাক্। এ সম্বন্ধে বিচার করিতে হইলে ইংরেজদের আগমনের আগে ভারতবর্ষের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা জানা দরকার। 'Land of Gold'—স্বর্ণ-ভূমি বলিয়া বিদেশীদের কাছে ভারতবর্ষের একটা খ্যাতি ছিল। এই খ্যাতির খাতিরে কলম্বস হইতে ভাস্কো ডি গামা পর্য্যন্ত অনেকেই ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে সমুদ্রের বুকে ভেলা ভাসাইয়াছিলেন। কিন্তু ভারতের সমৃদ্ধি প্রমাণের জন্য কেবল মাত্র এই খ্যাতির উপরে নির্ভর না করিয়া ঐতিহাসিক ও বিদেশী পরিব্রাজকদের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াও দেখানো যায় যে, দারিদ্র্য তো এ দেশে ছিলই না, বরং অপরিমিত প্রাচুর্য্যই ছিল এ দেশের স্বাভাবিক অবস্থা। তাহার দারিদ্র্য সুরু হইয়াছে এ দেশে ব্রিটিশ প্রাধান্য বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে।

ভারতবর্ষের অর্থ-নৈতিক অবস্থা

ইংরেজ অধিকারের পূর্ব্বে

ভারতবর্ষের অবস্থা যে অতিমাত্রায় স্বচ্ছল ছিল ইতিহাস ছাঁকিয়া তাহার সহস্র উদাহরণ দেওয়া যায়। এ সম্বন্ধে কয়েকটি বিদেশীর মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল :—

"নাইল নদের উপত্যকায় পিরামিড যখন গড়িয়া উঠে নাই, যখন ইউরোপীয় সভ্যতার আদি ভূমি গ্রীস এবং ইটালী বনাভ্যন্তরেই জনগণকে লালন-পালন করিতেছিল, তখনও ভারতবর্ষ সম্পদ ও ঐশ্বর্য্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। কর্ম্ম-তৎপর জন-গণ শিল্পের পণ্যে দেশকে ভরিয়া তুলিত, কৃষকদের শ্রম বৎসরের পর বৎসর পুরস্কৃত হইত প্রকৃতির অপূর্ব্ব দান— শস্য-সম্ভারের দ্বারা। * * * ভাস্কর এবং শিল্পীরা যে সমস্ত শিল্প রচনা করিত, সহস্র সহস্র বৎসর পরে কোনো কোনো জিনিষে আজিও তাহার তুলনা মিলে না। ভারতের প্রাচীন অবস্থা অন্যান্য সাধারণ সমৃদ্ধিতে পূর্ণ ছিল।" থর্ণ টন—(Description of Ancient India).

"সমস্ত যুগেই স্বর্ণ এবং রৌপ্য, বিশেষভাবে শেষোক্ত জিনিষটি অত্যন্ত লাভজনকভাবে এ দেশে আমদানী হইত। প্রয়োজনীয় জিনিষের জন্যই হোক্, অথবা বিলাস-পণ্যের জন্যই হোক্, বিদেশের উপর নির্ভর করিবার এত অল্প প্রয়োজন ভারতবর্ষের মতো পৃথিবীতে আর কোথাও দেখা যায় না। দেশের অনুকূল আবহাওয়া এবং জমির উর্ব্বরতার সঙ্গে তাহাদের উদ্ভাবনী শক্তি মিলিত হওয়ায় তাহারা যাহা ইচ্ছা করিয়াছে, তাহাই লাভ করিয়াছে। ফলে তাহাদের সহিত ব্যবসা সকলেরই একটি বিশেষ ধারায় নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। তাহাদের প্রাকৃতিক বা শিল্পজাত দ্রব্য সমূহের বিনিময়ে মূল্যবান ধাতু দ্রব্য সমূহই সমস্ত দেশকে দিতে হইয়াছে।" —রবার্টসন—(Historical Disquisition Concerning India)

কেবল মাত্র প্রাচীন ভারতে নহে, ব্রিটিশ শাসন আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেও যে ভারতে স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্য্যের অভাব হয় নাই, বিদেশী ও ঐতিহাসিকগণের লেখায় তাহারও অজস্র প্রমাণ আছে।

"ঔরঙ্গজেবের কুশাসন সত্ত্বেও তাঁহার পরবর্ত্তী কতকগুলি দুর্ব্বল ও দুশ্চরিত্র বাদশার রাজত্ব সত্ত্বেও ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দের নাদির শার আক্রমণের দ্বারা পরিমিত ধন-রত্ন লুণ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও দেশ ধরিতে গেলে বেশ সমৃদ্ধ অবস্থাতেই ছিল।"—Reform Pamphlet.

"যখন মারাঠাদের দেশে প্রবেশ করিলাম, আমার মনে হইল স্বর্ণ যুগের সহজ সারল্য এবং আনন্দের ভিতর দিয়া যাত্রা করিয়াছি। প্রকৃতির চেহারা এখনও কিছুমাত্র বদলায় নাই, দুঃখ এবং যুদ্ধ যেন এখনও ইহাদের অজ্ঞাত। লোক-জন আনন্দপূর্ণ, স্ফূর্ত্তিবান ও নিটোল স্বাস্থ্য-সম্পন্ন। বন্ধু, প্রতিবেশী ও অপরিচিত—সকলের জন্যই ইহাদের গৃহ-দ্বার উন্মুক্ত।"—পরিব্রাজক Anquitil du Perron.

"বাঙ্গলা সম্বন্ধে (ষোড়শ শতাব্দীতে) পারকাস লিখিয়াছেন—'এখানে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে গম, চিনি, আদা, লঙ্কা, তুলা এবং রেশম পাওয়া যায়। স্থানের আবহাওয়াও চমৎকার।' ভারর্থেমা বলেন—'এই দেশটি শস্য সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সমৃদ্ধ। সর্ব্ব প্রকারের মাংস এখানে পাওয়া যায়। চিনি এবং আদার পরিমাণ সুপ্রচুর। এখানে এত তুলা উৎপন্ন হয় যে, দুনিয়ায় আর কোথাও সেরূপ হয় না।"—রাধাকুমুদ মুখার্জ্জী—Indian Shipping.

"সহরটি (মুর্শিদাবাদ) লণ্ডনের মতই প্রকাণ্ড, জন-বহুল এবং সম্পদশালী। প্রভেদ এই—মুর্শিদাবাদে এমন সব ধনী আছেন যাঁহাদের ধন-সম্পদের পরিমাণ লণ্ডনের ধনীদের ধন-সম্পদ অপেক্ষা বহু গুণে বেশী।"—লর্ড ক্লাইভ।

অর্থ-নৈতিক অবস্থা—ইংরেজী আমলে

এই তো গেল ইংরেজ আসার আগে এবং অব্যবহিত পরে ভারতের অর্থ-নৈতিক অবস্থা। ব্রিটিশ-শাসনের অওতায় এই অবস্থা কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এইবার তাহাই যাচাই করিয়া দেখা যাক্। এ সম্বন্ধেও আমরা আমাদের নিজেদের কোনো অভিমত দিতে চাহি না। বিদেশী পুথি-পত্র হাতড়াইয়াই কতকগুলি মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:—

"জর্জ্জ স্মিথ এস্কোয়ারকে সাক্ষ্য দিবার জন্য উপস্থিত হইতে আদেশ করা হয়। তিনি উপস্থিত হইলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল—তিনি ভারতবর্ষের কোথায় কত দিন বাস করিয়াছেন। তিনি উত্তর দিলেন—১৭৬৪ সালে তিনি ভারতবর্ষে পৌছেন, ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৭৯ সালের অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত মাদ্রাজে বাস করিয়াছেন। তাঁহাকে আবার জিজ্ঞাসা করা হইল—তিনি যখন প্রথমে মাদ্রাজে আসেন তখন সেখানকার বাণিজ্যের অবস্থা কিরূপ ছিল? তিনি উত্তর দিলেন—অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী। মাদ্রাজ তখন ছিল ভারতবর্ষের প্রধানতম বাজার-গুলির অন্যতম। তারপর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়—এদেশে আসার পরেই ব্যবসা এবং কৃষি সম্পর্কে কর্ণাটিকের অন্তর্গত প্রদেশ সমূহের অবস্থা তিনি কিরূপ দেখিয়াছিলেন? তিনি বলেন কর্ণাটিকে কৃষির অবস্থা তখন খুব ভালো ছিল এবং স্থানটি জনপূর্ণ ছিল। সুতরাং ব্যবসা-বাণিজ্যের বহু দ্রব্যও সেখানে আমদানী হইত। তারপর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়—তিনি যখন মাদ্রাজ পরিত্যাগ করেন তখন কৃষি, লোক-জনের বসতি এবং আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য-ব্যাপারে তাহার অবস্থা কিরূপ ছিল? তিনি উত্তর দেন—কৃষির অত্যন্ত অবনতি হইয়াছে, জন-সাধারণের অবস্থাও

তদনুরূপ, ব্যবসা বাণিজ্যও অতিমাত্রায় কমিয়া গিয়াছে।”—‘হাউস ,অব কমন্স’ দ্বারা গঠিত ১৭৮২ সালের সিলেক্ট কমিটির কাছে প্রদত্ত সাক্ষ্য।

“ভারতের লক্ষ লক্ষ লোক মাত্র অর্দ্ধ একর পরিমিত ভূমির সাহায্যে জীবিকার্জ্জনের চেষ্টা করে। প্রতিনিয়ত অনশনের সহিত তাহাদিগকে যুদ্ধ করিতে হয় এবং এ যুদ্ধে সর্ব্বদাই তাহাদের পরাজয় ঘটে। মানুষের মতো বাঁচিয়া থাকা, জীবন ধারণের জন্য যে সমস্ত সুখ-সুবিধা অতি সাধারণ লোকের পক্ষেও আবশ্যক সেই সব সুখ-সুবিধার ভিতর দিয়া বাঁচিয়া থাকা—এ গুলি তাহাদের সমস্যা নহে, তাহাদের সমস্যা কোনো রকমে টিঁকিয়া থাকা—মৃত্যুকে কোনো রকমে ঠেকাইয়া রাখা। একথা নিঃসংশয়েই বলা যায় যে, যে সমস্ত অঞ্চলে ভালো রকম জল-সরবরাহের ব্যবস্থা আছে সেই সব প্রদেশ ছাড়া ভারতের দুর্ভিক্ষ নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার, তাহা মহামারীর মতোই সংক্রামক।”—Mr. W. S. Lilly.

“আমি বলিতে একটুও দ্বিধাবোধ করিতেছি না যে, কৃষক সম্প্রদায়ের অর্দ্ধেক লোক পূর্ণাহার কাহাকে বলে জানে না। বৎসরের পর বৎসর তাহাদের এইরূপ অবস্থা চলিতেছে।”—Sir Charles Elliott.

“ভারতীয় দুর্ভিক্ষের কঠোরতা বাড়িতেছে এবং এখন তাহা প্রায়শঃ সঙ্ঘটিত হয়। কৃষকদের দারিদ্র্য গভীরতর হইয়া উঠিয়াছে। গ্রামবাসীরা অসম্ভবরূপে দেনার দায়ে জড়িত, নিরাশা তাহাদের দিনের পর দিন মাত্রা অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে। প্রতিনিয়ত জমির দর বাড়াইবার যে পদ্ধতি তাহার পরিবর্ত্তন হয় নাই। লবণের শুল্ক যদিও কিছু কমিয়াছে তবু এখনও তাহা দরিদ্রকে শোষণ করিতেছে। ক্ষুধা এবং ক্ষুধা হইতে যে সব ব্যাধি উৎপন্ন হয়, তাহাদের বিস্তারের গণ্ডী না কমিয়া বরং বাড়িয়াই উঠিতেছে।

দাক্ষিণাত্যের প্রজারা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র কৃষক। রাজস্বের পদ্ধতির কোনো পরিবর্ত্তন হয় নাই। যে সব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দেশের শিল্পের ক্ষতি করিয়া ইংরেজদের ব্যবসার সুবিধা করিয়া দেয় তাহারও কোনো পরিবর্ত্তন হয় নাই। যাহা ২৫ বৎসর পূর্ব্বে খারাপ ছিল তাহা আজ অধিকতর খারাপ হইয়া উঠিয়াছে। মোটের উপর বিদেশীদের উদর পূর্ত্তির জন্য ভারতের খাদ্য-দ্রব্যের শোষণ তেমনি ভাবেই চলিতেছে। অর্থনৈতিক দুর্ভিক্ষ এবং স্থায়ী মহামারী—এগুলি এরূপ ব্যাপার যে, সরকারী কোনো হিসাব-পত্রই তাহা উড়াইয়া দিতে পারে না।"—Mr. Wilfred Scawen Blunt.

ভারতের দারিদ্র্যের জন্য দায়ী কে

কথা উঠিতে পারে ভারতবর্ষ পূর্ব্বে ঐশ্বর্য্যশালী ছিল একথা স্বীকার করিলেও ইংরেজেরা তাহার পরবর্ত্তী দারিদ্র্যের জন্য দায়ী না-ও হইতে পারে। নিজেদের কর্ম্ম-বিমুখতা বা প্রাকৃতিক বৈষম্যের ফলেও ভারতবর্ষের নিঃস্ব হওয়া অসম্ভব নহে। একথার এক উত্তর এই যে শাসন-দণ্ড যাহার হাতে থাকে তাহার শুভেচ্ছা, সতর্ক দৃষ্টি ও শাসন-নৈপুণ্যের উপরেই প্রজার শ্রী ও সমৃদ্ধি নির্ভর করে। দেশের সাধারণ অবস্থার উন্নতির জন্যই প্রজারা রাজ-কর দেয়। সেই রাজ-করের বিনিময়ে যদি রাজা তাহাদের অবস্থার উন্নতি-সাধন করিতে না পারেন, তবে সে রাজ-কর গ্রহণ করিবারও তাঁহার অধিকার থাকে না। কিন্তু অনধিকারের কথা ছাড়িয়া দিলেও ভারতের এই গভীর দারিদ্র্যের মূলে যে ইংরেজদের দায়িত্ব আছে নিরপেক্ষ রাজনৈতিকেরা সে কথাও স্বীকার করিতে দ্বিধা করেন নাই। দৃষ্টান্ত দিতেছি—

"কোম্পানীর দেওয়ানীর গ্রহণের পর হইতেই এদেশের লোকের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে—একথা মনে করিতেও ইংরেজের মনে দুঃখ হয়। কিন্তু তবু আমার বিশ্বাস—এ সম্বন্ধে কোনো সংশয় নাই। এ অবস্থা নিম্নলিখিত কারণগুলি হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে করি—কোম্পানীর দাদন পূর্ণ করিবার পদ্ধতি; বহুল পরিমাণে আমদানীর পরিবর্ত্তে প্রতি বৎসর টাকার রপ্তানী: খাজনা আদায় সম্বন্ধে কড়াক্কড় ব্যবস্থা; বাহবা লাভের জন্য স্বপদে প্রতিষ্ঠিত থাকা কালে ভবিষ্যতে খাজনা বৃদ্ধির ফল কিরূপ হইবে সে সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা না করিয়াও কর্ম্মচারীদের দ্বারা খাজনা বৃদ্ধির চেষ্টা; যে উপায়ে খাজনা আদায় করা হয় তাহার ভিতরে, বিশেষ ভাবে 'আমীন'দের নিয়োগ ব্যাপারে যে সমস্ত ভুল-ভ্রান্তি আছে তাহা। আমার মতে এই সমস্তই প্রধান কারণ যাহার জন্য অত্যন্ত খামখেয়ালী শাসনেও যে দেশের সমৃদ্ধি অব্যাহত ছিল সেই সুন্দর দেশটি নষ্ট হইতে বসিয়াছে এবং নষ্ট হইতে বসিয়াছে তখনই যখন প্রকৃতপক্ষে তাহার শাসনের বেশীর ভাগই ইংরেজদের হাতে ন্যস্ত।"—Mr. Philip Francis.

"ভারতবর্ষের নহে ইংলণ্ডের নিজের উপকারের জন্যই ইংলণ্ড যে ভারতবর্ষকে শাসন করিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। * * * মিঃ মর্লি তাঁহার এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, তিনি আশা করেন—তাঁহাকে ভারতীয় দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী করা হইবে না। * * * ইহা সম্ভব নহে যে, কোনো তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি লোক, যিনি সঠিক সংবাদ রাখেন তিনি প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে ভুল করিবেন। এই সমস্যার উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা কারণ আছে যাহা এখানে আমি আলোচনা করিতে চাই না। কিন্তু একটা ব্যাপার সুস্পষ্ট যে, ভারতবর্ষে যে সমস্ত পণ্য উৎপন্ন হয় তাহা যদি সেইখানেই রাখা যাইত

তবে কোনো বৎসরে—কোনো সময়েই ভারতবর্ষে খাদ্যের অভাব হইত না। মুস্কিল এই যে, ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট যে ট্যাক্স নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহা উৎপন্ন শস্যের মূল্যের শতকরা ৫০ ভাগ। ইংলণ্ডের এই বাৎসরিক কর হইতে এক ডলারও কমাইবার জো নাই এবং এই জন্যই ভারতবাসীরা অনশনে থাকে। সমস্ত জন-সংখ্যার শতকরা ৮৫ জন লোক কৃষির দ্বারা জীবিকার্জ্জন করে। কারণ ইংলণ্ডের চুল চেরা কর-ভার স্থানীয় শিল্পের, ধরিতে গেলে প্রায় সমস্তগুলিকেই ধ্বংস করিয়াছে।"—Dr. Hall (Barrows Lecturer).

"ভারতের লক্ষ লক্ষ লোক বহু বিজয়ীর নিকট মাথা নত করিয়াছে। কিন্তু ব্রিটিশ-শাসন-ভার তাহাদিগকে যেরূপ ভাবে চূর্ণ করিতেছে আর কেহই সে ভাবে করে নাই। বস্তুতঃ এই ভাবে লক্ষ লক্ষ লোক চূর্ণ হইয়া ধ্বংস হইতেছে। ইহার ফলে যে একটা বিরাট বিপত্তি ঘনাইয়া আসিতেছে ইংরেজ লেখকরাও তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন। অন্যান্য বিজেতারা ভারতবর্ষেই বাস করিতেন এবং তাঁহারা উৎপীড়ক বা দুষ্ট হইলেও জন-সাধারণকে বুঝিতেন এবং জন-সাধারণও তাঁহাদিগকে বুঝিত। কিন্তু ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা সেইরূপ একটা বড় জমীদারীর মতো যাহার জমিদার বিদেশী এবং জমিদারীতে কখনো পদার্পণ করেন না।"—Mr. Henry George.

শিক্ষার দিক দিয়া ভারতবর্ষের অবস্থা

আর্থিক অবস্থার পরেই যে কোনো দেশের সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় তাহার শিক্ষার দ্বারা। কারণ জাতির সভ্যতা, তাহার নৈতিক ও জাতিগত বৈশিষ্ট্য, পৃথিবীর অগ্রগতির সহিত তাহার সমান ভাবে পা

ফেলিয়া চলিবার শক্তি—এগুলি সমস্তই নির্ভর করে তাহার শিক্ষার উপরে—তাহার জ্ঞানের উপরে। বিদেশীরাও এই শিক্ষা না থাকার দোহাই দিয়াই আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার উপরে সীমা-রেখা টানিয়া দিতেছেন। সুতরাং এ জিনিষটাও যাচাই করিয়া দেখা দরকার।

আদম সুমারীর রিপোর্টে ধরা পড়িয়াছে, ভারতবর্ষের লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা শতকরা ৭ জন মাত্র। ভারতবর্ষ যখন স্বাধীনতা চায় তখন এই অজ্ঞতার দিকে আঙ্গুল নির্দ্দেশ করিয়া আমাদের বিদেশী মুরুব্বিরা উপহাসের হাসি হাসেন। সুতরাং এই সঙ্গেই বিচার করিয়া দেখা উচিত—আমাদের এই যে অজ্ঞতা ইহা কিসের ফল। আজ ইংলণ্ডের শিক্ষিত লোকের সংখ্যা শতকরা ৯৩ জন। বিশ্বের সমস্ত স্বাধীন জাতির শাসন-শক্তি, জন-মত, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক আবেষ্টন যখন জ্ঞানের জন্য তাগিদ দিয়া রাষ্ট্রের অন্তর্গত সর্ব্ব-সাধারণের মনকে শিক্ষার প্রতি উন্মুখ করিয়া তুলিয়াছে, তখনই ইংলণ্ডের শিক্ষার অবস্থা এইরূপ। কিন্তু বহু শত বৎসর পূর্ব্বেও যখন শিক্ষার জন্য আজিকার এই অনুপ্রেরণা জগতের কোথাও ছিল না, তখনকার দিনেও ভারতবর্ষ শিক্ষাকে উপেক্ষা করে নাই। শিক্ষার ধারা তখনও ভারতবর্ষের সমাজের স্তরে স্তরে সহজ ও স্বাভাবিক ভাবেই প্রবাহিত ছিল।

শিক্ষার বিচার দুই রকমে করা যায়—এক তাহার উৎকর্ষের দিক দিয়া, আর তাহার বিস্তারের দিক দিয়া। উৎকর্ষের দিক দিয়া ভারতীয় শিক্ষা কিরূপ ছিল প্রথমে তাহারই পরিচয় দিতেছি :—

"ব্রাহ্মণ শিক্ষকেরা কেবল মাত্র এমন একটা শিক্ষা-পদ্ধতিরই প্রবর্ত্তন করেন নাই যাহা বহু সাম্রাজ্যের ধ্বংস ও সমাজের পরিবর্ত্তনেও নষ্ট হয়

নাই, পরন্ত যাহা হাজার বৎসর ধরিয়া জ্ঞানের উজ্জ্বল শিখা জ্বালাইয়া রাখিয়াছে। এই ব্রাহ্মণ শিক্ষকেরা ভারতবর্ষের শিক্ষার উপরে তাঁহাদের চিহ্ন তো অঙ্কিত করিয়াছেনই, জগতের চিন্তা রাজ্যেও তাঁহারা রেখাপাত করিয়া গিয়াছেন।"—Rev. F. E. Keay.

"হিন্দু-মুসলমান-শিখ সম্প্রদায়ের সমস্ত শ্রেণীর ভিতর শিক্ষার জন্য যে একটা গভীর ইচ্ছা ও শ্রদ্ধা আছে এবং এই সূর্য্যালোকিত দেশ যে তাহার সন্তানগণকে অসাধারণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে মণ্ডিত করিয়াছে তাহার সাক্ষ্য দিতে আমি কিছুমাত্র দ্বিধা করি না। * * * বর্ত্তমানেও যেমন ৩০০০ হাজার বৎসর পূর্ব্বেও তেমনি, প্রাচ্যদেশ মানসিক শিক্ষা, উৎকর্ষ ও চিন্তাশীলতার আবাসভূমি ছিল। প্রধানতঃ প্রচার-ব্যবস্থার অভাব এবং যাতায়াতের অসুবিধার জন্যই ইহাদের প্রতিভা সার্ব্বজনীন হইলেও তাহা উপেক্ষিত হইয়াছে।"—Dr. Leitner.

অন্যত্র এই ডাক্তার লিটনারই বলিয়াছেন—"যেমন ভারতবর্ষের শিল্প-পণ্যের নমুনার প্রবর্ত্তনের দ্বারা আমাদের কারিকরদের ভিতর বর্ত্তমান শিল্প-রুচির উন্নতি সাধিত হইয়াছে, যেমনি ইহার বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষা-দান-পদ্ধতি ইংলণ্ডের স্কুল সমূহকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে।"

"সামাজিক শিক্ষা—পুস্তকের বাহিরের শিক্ষা বলিয়া একটি জিনিষ আছে। খ্রীষ্টানদের দেশের যে কোনো স্থান অপেক্ষা ভারতবর্ষের এই শিক্ষা নিঃসংশয়ে শ্রেষ্ঠতর। পুরাণের গল্প এবং উপকথার আবৃত্তির দ্বারা, ধর্ম্ম সঙ্গীত এবং অভিনয়ের দ্বারা, মিছিল ও প্রদর্শনী প্রভৃতির দ্বারা, উৎসব এবং ধর্ম্ম কর্ম্মের দ্বারা, মেলা এবং তীর্থ-পর্য্যটন প্রভৃতির দ্বারা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র জন-সাধারণ এমন একটা সাধারণ শিক্ষা ও মানসিক

উৎকর্ষ লাভ করে যাহা বিদ্যালয়ে পড়িয়া এবং সংবাদপত্র পড়িয়া যে জ্ঞান অর্জ্জিত হয় তাহা অপেক্ষা কোনো অংশে হীন তো নহেই বরং বহু অংশেই শ্রেষ্ঠতর। এমন কি পাশ্চাত্য দেশে গির্জ্জার শিক্ষার ভিতর দিয়া যে জ্ঞান লাভ হয় উহা তাহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। সে শিক্ষা মানবতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইবার শিক্ষা।"—Max Muller.

কিন্তু কেবল মাত্র উৎকর্ষের দিক দিয়া নহে বিস্তারের দিক দিয়াও ভারতবর্ষের শিক্ষা হীন ছিল না। সমস্তটা ভারতবর্ষই স্বয়ং-সম্পূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক গ্রামেই পাঠশালা, টোল, মক্তব প্রভৃতি ছিল এবং সেই সব প্রতিষ্ঠানে দেশের লোক প্রাথমিক পাঠ ও নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিত। তাহা ছাড়া এ দেশের প্রায় প্রত্যেকটি ধর্ম্ম-মন্দির, বৌদ্ধ-বিহার বা মস্‌জিদও জ্ঞান বিতরণের ক্ষেত্র ছিল। এইরূপে নর-নারী নির্ব্বিশেষে এ দেশের সকলেই জ্ঞানার্জ্জনের সুবিধা লাভ করিয়াছে। বিদেশীদের বিবরণ হইতেই ইহারও অজস্র প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যায়ঃ—

"কোনো একটি স্থানের অধিবাসী কেবল কতকগুলি ব্যক্তির সমষ্টি মাত্র ছিল না পরন্তু তাহা একটি সুনিয়ন্ত্রিত সমাজ ছিল। * * * প্রত্যেক স্থানেই সমাজের ভিতর কতকগুলি কর্ম্মচারী ছিলেন যাঁহারা গ্রাম্য জীবনের পক্ষে যে সমস্ত ব্যবস্থা অপরিহার্য্য তাহাই পালন করিতেন। * * * একজন কর্ম্মচারী ছিলেন বিদ্যালয়ের গুরুমহাশয়। তিনি জ্যোতির্ব্বিদও ছিলেন, যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই পদ ভিন্ন লোকের দ্বারাও অধিকৃত হইতে দেখা যায়। প্রত্যেক হিন্দু গ্রামে যেখানে হিন্দু-বৈশিষ্ট্যের কিছুমাত্র অবশিষ্ট আছে সেইখানে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাও

দেখা যায়। অস্পৃশ্যদের ছাড়া এমন একটি শিশুও ছিল না যে, পড়িতে লিখিতে, গণনা করিতে জানে না।"—Mr. Ludlow.

"১৮৫২ সালের সেটেলমেণ্ট রিপোর্টে দেখা যায় যে, হোসিয়ারপুরের মতো অনুন্নত জেলাতেও প্রতি ১৯·৬৫ জন পুরুষ অধিবাসীর (প্রাপ্ত বয়স্ক এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক) ভিতর একটি করিয়া বিদ্যালয় ছিল। বর্ত্তমানে প্রতি ২৮১৮·৭ জন অধিবাসীর ভিতর একটি করিয়া গবর্ণমেণ্ট বা গবর্ণমেণ্ট সাহায্য-প্রাপ্ত স্কুল আছে। এই দুইটি সংখ্যা তুলনা করিয়া দেখার উপযুক্ত।"—Dr. Leitner.

"এই সব শিক্ষা-পদ্ধতির (ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ মুসলমান শিক্ষা-পদ্ধতি) পাশে পাশে কোনো এক সময়ে এবং ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত স্থানেই জন-সাধারণের প্রাথমিক শিক্ষারও একটি পদ্ধতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সব শিক্ষাগারের দ্বার সমস্ত লোকের পক্ষেই খোলা ছিল। সাধারণের লেখা-পড়া এবং গণিত বিদ্যা শিক্ষা করার আগ্রহ পূর্ণ করার জন্যই এগুলির উদ্ভব হয় এবং এগুলি প্রধানতঃ ব্যবসায়ী এবং কৃষক সম্প্রদায়ের শিক্ষাদানের কাজেই ব্যবহৃত হইত।"—Rev. Keay.

ইংরেজী আমলে শিক্ষার অবস্থা

এদেশে ইংরেজদের প্রতিষ্ঠার পরেই শিক্ষার এই সুন্দর শৃঙ্খলার ভিতর পরিবর্ত্তন সুরু হয়। সেই শৃঙ্খলার ভিতরেও কিছুদিন পর্য্যন্ত কেবলমাত্র সংস্কারবশেই এদেশের লোক লেখা-পড়ার চর্চ্চা বজায় রাখিয়াছিল। রেভারেণ্ড কী, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান রেকর্ডস এবং ব্রিটিশ কর্ম্মচারীদের সাক্ষ্য হাতড়াইয়া প্রমাণ করিয়াছেন:—

"ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের শিক্ষা-ভার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষে সুবিস্তৃত জন-প্রিয় একটি শিক্ষা পদ্ধতি ছিল। এই শিক্ষা-পদ্ধতি দুইটি বা একটি প্রদেশের ভিতর নিবদ্ধ ছিল না, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই ইহা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তবে কোনো কোনো জেলা অন্য জেলা অপেক্ষা শিক্ষায় বেশী অগ্রসর হইয়াছিল—ইহাও ঠিক। ১৮২২—২৬ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজে যে অনুসন্ধান চলে তাহার ফলে দেখা যায় যে, বিদ্যালয় গমনোপযোগী বয়সের ছাত্রদের প্রতি ছয় জনের ভিতর একজন ছাত্র কোনো-না-কোনো রকমের শিক্ষা লাভ করে : বোম্বাইয়ে অনুরূপ অনুসন্ধানে দেখা যায় (১৮২৩—২৮) যে, প্রতি ৮ জনের ভিতর একটি বালক শিক্ষালাভ করে : মিঃ এডাম বাঙ্গলার একটি জেলায় অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পান যে, সমগ্র পুরুষ জন-সাধারণের শতকরা ১৩·২ জন শিক্ষালাভ করিতেছে।"

অনেকেই মনে করেন যে, এই হিসাবটা একান্ত অসম্পূর্ণ। কিন্তু যদি সম্পূর্ণ বলিয়াও ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও দেখা যায় যে, এ অবস্থাও বর্ত্তমান শিক্ষার অবস্থা হইতে ঢের ভালো। তাহা ছাড়া এই সম্পর্কে আরও একটা কথা বিবেচনা করিয়া দেখা দরকার। ভারতবর্ষের শিক্ষার এ হিসাব লওয়া হইয়াছিল তখনই যখন ইংরেজদের আগমনে এ দেশের সমস্ত ব্যাপারের ভিতরেই একটা ওলট-পালট সুরু হইয়া গিয়াছে। মিঃ Howell লিখিয়াছেন—"ব্রিটিশ শাসনে ভারতের শিক্ষা প্রথমে উপেক্ষিত হইয়াছে, তারপর তাহাতে জোর করিয়া এবং সাফল্যের সহিত বাধা দেওয়া হইয়াছে ; তারপর এমন একটা পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে যাহা এখন সর্ব্বতোভাবেই ভুল বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে এবং অবশেষে ইহা,

আসিয়া এই বর্ত্তমান অবস্থাতে উপনীত হইয়াছে।"—Progress of Education in India by H. Sharp. C. I. E.

স্থতরাং দেড়শত বৎসরের ব্রিটিশ-শাসন ভারতবর্ষকে যে ভাবে শিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছে ভারতবর্ষের যে কোন যুগে, এমন কি তাহার মহা-বিপর্যয়ের যুগেও ভারতবর্ষের শিক্ষার অবস্থা ও ব্যবস্থা যে তাহা অপেক্ষা ঢের ভালো ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভারতীয় শিল্পের অবস্থা

শিক্ষার মতোই দেশের শিল্পও আর একটি জিনিষ যাহা দেশের সমৃদ্ধি ও সভ্যতার পরিচয় প্রদান করে। এই শিল্পের দিক দিয়া বিচার করিলেও বোঝা যাইবে, বর্ত্তমান ভারতের জন্য ইংরেজদের গর্ব্ব করিবার কোনই হেতু নাই। বস্তুতঃ এ দেশের শিল্পকে ধ্বংস করিয়া তাহার স্থানে গ্রেট-ব্রিটেনের শিল্পকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই এদেশে ইংরেজ-সাম্রাজ্যের গোড়া-পত্তন। যাঁহারা মিছামিছি প্রীতির ভান করেন না তাঁহারা তো স্পষ্টই বলেন—"We did not conquer India for the benefit of the Indians. * * * We conquered India as the outlet for the goods of great Britain." অর্থাৎ ভারতবর্ষের উপকারের জন্য আমরা ভারতবর্ষকে জয় করি নাই। ভারতবর্ষকে জয় করিয়াছি গ্রেট-ব্রিটেনের মালপত্র বিকাইবার জন্য।—Joynson Hicks.

গ্রেট ব্রিটেনের এই মাল-পত্র বিকাইবার ব্যবস্থায় ভারতবর্ষের শিল্পের যে কি বিপুল সর্ব্বনাশ হইয়াছে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় ভারতবর্ষের প্রাচীন শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ইতিহাসের ভিতর দিয়া।

নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক মত উদ্ধৃত করিয়া এইবার তাহার পরিচয় প্রদান করিতেছি :—

"ভারতীয় শিল্পীদের তৈরী সূক্ষ্ম বস্ত্র, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের সংমিশ্রণ, ধাতু দ্রব্যে এবং মণি-মুক্তায় তাহাদের কারুকার্য্য, গন্ধ দ্রব্য এবং অন্যান্য সমস্ত প্রকার শিল্পদ্রব্য, প্রাচীনকালে পৃথিবী-ব্যাপী প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। * * দুই হাজার বৎসর আগেও ভারতে সূতা-কাটার কাজ এবং কাপড় বোনার কাজ যে উৎকৃষ্ট স্তরের সাফল্য লাভ করিয়াছিল তাহাও নিঃসংশয়েই বলা যায়।"—Imperial Gazetteer of India.—Vol III.

"ভারতের লোহার শিল্প কেবলমাত্র স্থানীয় প্রয়োজনই মিটায় নাই, শিল্প-জাত লৌহ-পণ্য বিদেশেও রপ্তানী করা হইয়াছে। যে সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত হইত, উৎকৃষ্ট জিনিষ বলিয়া তাহাদের বিশ্ব-ব্যাপী সুনাম ছিল। * * * ছুরী কাঁচি প্রভৃতি নির্ম্মাণের জন্য ভারতীয় ইস্পাতের চাহিদা ইংলণ্ডেও ছিল। অন্ততঃ দুইহাজার বৎসর পূর্ব্বে এই ইস্পাত ও পেটা লোহার শিল্প ভারতে উচ্চস্তরের সাফল্য লাভ করিয়াছিল।"—Ranade's Essay on Indian Economics.

"সমস্ত যুগেই ভারতবর্ষের সহিত ব্যবসা একই ধরণের ছিল। আজ (১৮১৭ সালে) যে সমস্ত দ্রব্য সে বিভিন্ন দেশে সরবরাহ করিতেছে সেই সমস্ত দ্রব্য কেনার জন্য নিয়মিত ভাবে স্বর্ণ এবং রৌপ্য ভারতবর্ষে আসিয়াছে এবং সেই প্লিনির সময় হইতে এপর্য্যন্ত ভারতবর্ষ সমস্ত দেশের ধন-সম্পদ গ্রাসের গহ্বর বলিয়া অভিসম্পাত লাভ করিয়াছে। ধন-রত্ন অপ্রতিহতভাবে ভারতবর্ষে প্রবাহিত হইত, কিন্তু কখনো ভারতবর্ষ হইতে ফিরিয়া আসিত না।—রবার্টসন

ভারতীয় বস্ত্র শিল্পের সমৃদ্ধির কথা আমরা সকলেই জানি। ইংলণ্ডের বাজারেও উহা অসাধারণ বিস্তার লাভ করিয়াছিল। এই বিস্তারের স্বরূপ যে কি তাহা বোঝা যায় ইহার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন জাগিয়া উঠিয়াছিল তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে। সে আন্দোলনের নমুনা অন্য প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে। এখানে কেবল মাত্র এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই আন্দোলনের ফলে ভারতের শাসন নীতির ভিতর দিয়া যে সব ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল তাহাতেই ভারতবর্ষের বস্ত্র-শিল্প ধ্বংস হইয়া যায়। ভারতের বস্ত্র-শিল্প ধ্বংস করিয়া তাহার স্থান গ্রহণ করিয়াছে ইংরাজের বস্ত্র-শিল্প। একটির ধ্বংস এবং আর একটির সমৃদ্ধি বুঝাইবার জন্য এখানে দুইটি তালিকা পাশাপাশি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

বস্ত্রের আমদানী ও রপ্তানী

রপ্তানী (ভারতবর্ষ হইতে)		আমদানী (বিলাত হইতে)	
বৎসর	গজ	বৎসর	গজ
১৮১৪	১২,৬৬,৬০৮	১৮১৪	৮,১৮,২০৮
১৮২১	৫,৩৪,৪৫৯	১৮২১	১,৯১,৩৮,৭২৬
১৮২৮	৪,২২,৫০৪	১৮২৮	৪,২৮,২২০,৭৭
১৮৩৫	৩,০৬,০৮৬	১৮৩৫	৫,১৭,৭৭,২৯৭
১৮৪২	১,৮১,২২৪	১৮৭৫	৬১,৬৪,৩৬,৭৫২
১৮৪৯	৩৬,১৫২	১৯০৫	১,৩৭,৮৩,৬০,২৩৪
		১৯২৫	১,৪৮,৩৭,১৩,৪৪৬

একশত বৎসর আগে কেবল কলিকাতার বন্দর হইতে বিলাতে বৎসরে অন্ততঃ দুই কোটি টাকার বস্ত্রাদি রপ্তানী হইত। তখনকার দিনের দুই কোটি টাকা বর্ত্তমানের অন্ততঃ দশ কোটি টাকার সমান। আর আজ অন্ততঃ বৎসরে ৬০ কোটি টাকার বস্ত্র ভারতবর্ষকে আমদানী করিতে হয়। ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পের শোচনীয় ধ্বংসের অবস্থা দেখিয়াই কার্ল মার্কস্ লিখিয়াছেন,—"ব্রিটিশ আক্রমণই ভারতীয় তাঁতকে ধ্বংস এবং চরকাকে বিচূর্ণ করিয়াছে। ভারতীয় বাজার হইতে ভারতীয় বস্ত্র দূর করার দ্বারা তাহার এই ধ্বংসের কাজ সুরু হয়। তারপর সে হিন্দুস্থানে সূতা রপ্তানী করে এবং অবশেষে তুলার আদি ভূমিকেই বস্ত্রের দ্বারা প্লাবিত করিয়া দেয়। ১৮১৮ হইতে ১৮৩৭ সালের মধ্যে গ্রেট ব্রিটেন হইতে ভারতবর্ষে সূতার রপ্তানীর অনুপাত ১ হইতে ৫২০০ আসিয়া দাঁড়ায়।"

কেবলমাত্র বস্ত্র-শিল্প নহে, ভারতের এমনি আরো অনেক শিল্প ইংরেজদের শিল্প-প্রতিষ্ঠার জন্যই নষ্ট করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে ইংরেজদেরই অজস্র স্বীকারোক্তি আছে। নিম্নে মাত্র দুই একটির নমুনা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল:—

"ইংলণ্ডের সাধারণ নীতি ছিল—সে তাহার শিল্প দ্রব্য ভারতবর্ষকে ক্রয় করিতে বাধ্য করিবে এবং বিনিময়ে ভারতের কোন দ্রব্যই ক্রয় করিবে না। এ কথা সত্য যে, তুলার আমদানীতে তাহারা বাধাদান করিত না। যখন তাহারা দেখিল যে, যন্ত্রের সাহায্যে ভারতবর্ষ অপেক্ষা সস্তায় বস্ত্র বোনা যায় তখন তাহারা বলিয়া বসিল—তোমরা বস্ত্র বোনা পরিহার কর ও আমাদিগকে কাঁচা মাল দাও, আমরাই তোমাদিগকে বস্ত্র বুনিয়া দিব।"—Speech of Mr. Tierney in House of Commons in 1813.

"ইংলণ্ড তাহার কলের তৈরী দ্রব্যগুলি শতকরা ২॥০ মাত্র শুল্কে ভারতবর্ষের লোকদিগকে গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছে, কিন্তু হিন্দুদের হাতে-কাটা সূতা বা রেশমের উপর ২০৲ হইতে ৩০৲ টাকা পর্য্যন্ত শুল্ক বসাইতে দ্বিধা করে নাই। বিলাতে রপ্তানী করিতে গেলেই ভারতের চিনির উপর ট্যাক্স বসিয়াছে শতকরা ১৫০৲ টাকা, কাফির উপরে ২০০৲ টাকা, মরিচের উপর ৩০০৲ টাকা। যে দেশ হইতে ইংলণ্ড প্রতি বৎসর দুই কোটি ষ্টার্লিং আদায় করিয়াছে, যে দেশ হইতে এক লণ্ডন সহরেই প্রতি বৎসর রাজস্ব বাবদ ত্রিশ লক্ষ পাউণ্ডেরও বেশী গিয়াছে সেই দেশের উপর উপরোক্ত ব্যবস্থা প্রযুক্ত হইয়াছিল।"—Introduction to Martins' Eastern India —Vol, I.

কেহ কেহ হয়তো মনে করিতে পারেন, ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাভাবিক উদ্বর্ত্তনের ফলে ভারতবর্ষে শিল্প-বাণিজ্য আজ এইরূপ অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহাদের ধারণা যে ঠিক নহে উপরোক্ত মন্তব্যগুলি হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। একদিকে অমানুষিক অত্যাচার আর একদিকে অসঙ্গত শুল্ক-নীতি, এই দুই-এর মাঝখানে পড়িয়াই ভারত প্রতিযোগিতায় টিকিতে পারে নাই। এরূপ যুক্তিও কাহারো কাহারো মনে আসিতে পারে যে, অত্যাচার--সে তো দেড় শত দুই শত বৎসর আগের কথা, আজ তো সে অত্যাচার নাই, তবে কেন তাহার শিল্প এখনও গড়িয়া উঠিতেছে না। ইহার এক উত্তর এই দেওয়া যায় যে, একবার একটা জিনিষ ভাঙ্গিয়া ফেলিলে তাহা গড়িয়া তুলিতেও সময় লাগে। কিন্তু তাহা অপেক্ষাও বড় উত্তর আছে, সে উত্তর—দৈহিক

অত্যাচার আজ নাই বটে, কিন্তু আইনের অত্যাচার এখনও শেষ হয় নাই। এখনও ভারতবর্ষ বাণিজ্য-ক্ষেত্রে কেবলমাত্র ততটুকু সুবিধাই লাভ করিতেছে ব্রিটিশ-স্বার্থকে পূরামাত্রায় বাঁচাইয়া রাখিয়া যতটুকু সুবিধা পাওয়া সম্ভব। কথাটা বুঝিতে হইলে ইংরেজের সহিত ব্যবসা-সম্পর্কে এ দেশের আদান-প্রদানের ব্যবস্থাটাও বুঝিয়া দেখা দরকার।

ভারতবর্ষ যে কাঁচা মাল উৎপন্ন করে ইংলণ্ড সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণে সেই কাঁচা মাল খরিদ করিয়া লয় এবং তাহারই দ্বারা শিল্প-পণ্য উৎপন্ন করিয়া তাহার বেশীর ভাগই ভারতবর্ষে ব্যবসার জন্য ফেরৎ পাঠাইয়া দেয়। একথা বোঝা কঠিন নহে যে, কাঁচা অবস্থায় যে মালের দাম ১৲ টাকা, তাহার দ্বারা শিল্প-পণ্য তৈরী হইলে তাহার মূল্য বস্তু-বিশেষে ৫০৲ বা ৬০৲ বা ১০০৲ টাকা হওয়াও অসম্ভব নহে। ৺লালা লাজপত রায় যে হিসাব দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়, ১৯২৪-২৫ সালে ভারতবর্ষের সমস্ত রপ্তানীর ২৫.৪ ভাগই গিয়াছে ইংলণ্ডে (ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের হিসাব ধরিলে এই পরিমাণটা অবশ্য ঢের বাড়িয়া যাইবে। কারণ প্রতিবৎসর ভারতের রপ্তানীর প্রায় ৬০।৬২ ভাগই গ্রহণ করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য) এবং তাহার আমদানীর শতকরা ৫০.১ ভাগই আসিয়াছে ইংলণ্ড হইতে। ইংরেজ ব্যবসায়ীদের এই ব্যবসাকে জীয়াইয়া রাখিবার জন্য ভারতীয় শুল্কনীতির ভিতরে এমন অনেক বৈষম্য রাখিতে হইয়াছে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলে যাহা কখনো টিকিতে পারিত না। এইরূপে প্রতিযোগিতার পথ বন্ধ করিয়া ভারতের শিল্পের উৎকর্ষের পথও বহুল পরিমাণে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন করিয়া যেখানে তাহার কোনো বিশেষ

ব্যবসাকে বাঁচানো দরকার সেখানেও সে উপায় তাহার হাতে নাই। সুতরাং দৈহিক অত্যাচার না থাকিলেও ব্যবসার অগ্রগতিতে বাধা দান করিবার মতো রাজনৈতিক অত্যাচার যথেষ্টই আছে। একশত বৎসর পূর্ব্বে দৈহিক অত্যাচারের ফলে ভারতবর্ষের শিল্প নষ্ট হইয়াছিল, আজ অর্থনৈতিক অত্যাচারের ফলে ভারতীয় শিল্প মাথা তুলিতে পারিতেছে না। এইরূপে ইংরেজদের দ্বারা ভারতের শিল্পও যে ধ্বংস হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

এমনি ভাবে যে সমস্ত জিনিষের দ্বারা একটা জাতির সুখ-সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়, ইংরাজ শাসনের আওতায় আসিয়া ভারতবর্ষ তাহার কোনটিই পায় নাই, বরং সমস্তগুলিই হারাইয়াছে। তাহার সমৃদ্ধি গিয়াছে, শিল্প ধ্বংস হইয়াছে, জ্ঞান ও শিক্ষাও বিনষ্ট হইয়াছে। সুতরাং ইংরেজ যদি কোনো ভারত গড়িয়া থাকে তবে সে গড়িয়াছে নিঃস্ব, নিরন্ন, অশিক্ষিত, অধঃপতিত ভারতবর্ষ! স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিলটন লিখিয়াছেন —"রোম যেমন ব্রিটেনকে অকস্মাৎ পরিত্যাগ করিয়াছিল, ইংলণ্ডও যদি সেই ভাবে ভারতবর্ষকে পরিত্যাগ করে তবে তাহারা তাহাদের পিছনে এমন একটা দেশ রাখিয়া যাইবে যেখানে শিক্ষা নাই, স্বাস্থ্য নাই, অর্থ নাই।" ব্যাবসা-বাণিজ্য ব্যাপারে আমরা অবশ্য ইংরেজদের মতো পোক্ত নহি। কিন্তু সাধারণ বুদ্ধিতে যতটুকু বোঝা যায়, তাহাতেই বলা যায় যে, যে ব্যবসায়ী সমস্ত লাভ নিজে পকেটস্থ করিয়া কেবল জমার তহবিলটাই শূন্য দেখায় না, সঙ্গে সঙ্গে মোটা ঋণের অংশে অংশীদারের খাতার পাতাগুলি ভরিয়া ফেলে তাহার অংশীদারিত্ব বজায় রাখার দাবী খুব জোরালো দাবী নহে এবং তাহার

সহিত বিচ্ছিন্ন হওয়ার ইচ্ছাও স্বাভাবিক। ইংরেজ যে ভারত গড়িয়া তুলিয়াছে সে ভারত গড়িয়া তুলিবার জন্য ইংরেজদের গর্ব্ব করিবার কিছু নাই, বরং বর্ত্তমান ভারত তাহার লজ্জা—তাহার অগৌরবেরই ইতিহাস। যাহা অগৌরবের ব্যাপার তাহা কোনো অধিকারের দাবী প্রতিষ্ঠিত করে না।

ব্রিটিশ ভারত

ইংরেজেরা বলেন—ভারতবাসীর ইচ্ছায় ও সহযোগিতায় তাঁহারা বর্ত্তমান ভারত গড়িয়া তুলিয়াছেন। বর্ত্তমান ভারতের বেশ একটা বড় অংশই যে ইংরেজের দ্বারা গঠিত তাহা অস্বীকার করিবার জো নাই। কিন্তু এ গড়িয়া তোলায় ভারতবাসীর কতটুকু হাত আছে তাহা বলা শক্ত। অন্ততঃ Willing Co-operation—স্বেচ্ছাকৃত সহযোগ যে ছিল না তাহা অনায়াসেই বলা যায়। ভারতের সেই দুর্দ্দিনের কতকগুলি পথ-ভ্রান্ত লোক নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য বিদেশীদের সঙ্গে যোগ দিয়া নানা স্থানে রাষ্ট্র-বিপ্লব সঙ্ঘটিত করিয়াছিল—এ কথা সত্য। কিন্তু দেশকে পরদেশীর হাতে ছাড়িয়া দেওয়ার কল্পনা তাহাদের কাহারো হয়তো ছিল না, এবং যে সব বিদেশীর সাহায্য তাহারা পরস্পরের বিরুদ্ধে সেদিন গ্রহণ করিয়াছে সেই সব বিদেশীই একদিন ভারতের মনসদ গ্রহণ করিবে—এ আশঙ্কাও হয়তো তাহারা করে নাই। যদি করিত তবে সে সাহায্য তাহারা মোটেই গ্রহণ করিত কি না সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বস্তুতঃ ভারাটিয়া সৈন্যকে যে ভাবে গ্রহণ করা হয় ঠিক ভাবেই সেদিন ইউরোপীয় সৈন্যদের ব্যবহার করা হইয়াছিল—সে সৈন্যদের ভিতর ফরাসী সৈন্যও ছিল, ইংরেজও ছিল, ওলন্দাজ-দিনেমারও ছিল।

ভারতের ভাগ্য-লক্ষ্মী একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবেই ইংরেজের গলাতে বর-মাল্য অর্পণ করিয়াছিলেন। ইংরেজেরা প্রায় দুইশত বৎসরের চেষ্টায় এ দেশে তাঁহাদের সিংহাসনের ভিৎটা প্রচুর পরিমাণে দৃঢ় করিয়াও তুলিয়াছেন। কিন্তু এ তোলায় দেশের লোকের সহযোগিতা আছে কতটুকু? হিসাব করিয়া দেখিলে এই কথাই বলিতে হয়—ইংরেজ রাজনৈতিকেরা যত জোরেই এই সহযোগিতার কথা প্রচার করুন না কেন, সাধারণের সহযোগিতা তাঁহারা পান নাই। তাঁহাদের বুদ্ধির কৌশলে জন-সাধারণ হয়তো প্রতারিত হইয়াছে, তাঁহাদের পিঠ-চাপড়ানোতে হয়তো খানিকটা আত্ম-বিস্মৃতিও তাহাদের ঘটিয়াছে, তাঁহাদের ধমকানীতে ভয় যে না পাইয়াছে তাহাও নহে। কিন্তু সেই সহযোগিতা যাহা সমানে সমানে ঘটে, যাহা বিচার-বুদ্ধি, স্বাধীন ইচ্ছা, ও আত্ম-নিয়ন্ত্রণের শক্তি বজায় রাখিয়া মানুষ মানুষকে দান করে, ভারত-সাম্রাজ্য গড়নের কাজ তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না।

নজীর স্বরূপ এ দেশের জনকতক ইংরেজী-শিক্ষিত লোকের দৃষ্টান্ত হয়তো ইংরেজেরা চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিবেন। কিন্তু বিভ্রান্ত-দৃষ্টি এই সব ভারতবাসী ভারতবর্ষের অগণিত জন-সঙ্ঘের প্রতিনিধিও নহেন, ভারত-বর্ষের প্রতিনিধিত্ব করিবার শক্তিও তাঁহাদের নাই। ইংরেজ যে অত্যন্ত দূর-দৃষ্টি-সম্পন্ন কূটনীতি-বিশারদ জাতি তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই এ দেশের বুকে রাজ্য-পাট প্রতিষ্ঠিত করার পরেই তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এমন কতকগুলি লোক এ দেশের ভিতর হইতেই সংগ্রহ করা দরকার যাহারা নামে মাত্র ভারতবাসী, কিন্তু শিক্ষায়, দীক্ষায়, সভ্যতায় ধারণায় ও অনুপ্রেরণায় যাহারা খাঁটি ইংরেজ। বস্তুতঃ এই

সঙ্কল্প হইতেই এ দেশের সর্ব্ব স্তরের ভিতর প্রসারিত, ভারতীয় সভ্যতার ধারায় অনুপ্রাণিত শিক্ষার ব্যবস্থাকে নষ্ট করিয়া ইংরেজেরা গড়িয়া তুলিতে কৃত-সঙ্কল্প হন বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতি। কথাটা যে আমাদের মন-গড়া নহে তাহার অজস্র প্রমাণ আছে। বিদেশীদের নিজেদের স্বীকারোক্তি হইতেই নিম্নে দুই একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল ঃ—

"রোমানেরা ইউরোপের জাতি সমূহকে সভ্য করিয়া তুলিয়াছিল এবং তাহাদিগকে রোমানদের হাব-ভাবে দীক্ষিত করিয়া নিজেদের শাসনের প্রতি তাহাদিগকে পক্ষপাতী করিয়া তুলিয়াছিল। * * * ইটালী, স্পেন, আফ্রিকা এবং গল—ইহাদের রোমানদের অনুকরণ করা ছাড়া এবং তাহাদের সঙ্গে সুখ-সুবিধার অধিকার ভোগ করা ছাড়া আর কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল না। ফলে তাহারা শেষ পর্য্যন্ত সাম্রাজ্যের বিশ্বস্ত প্রজাই ছিল। * * * আমি আশা করি যে, ভারতবাসীও শীঘ্রই আমাদের সম্পর্কে এই অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইবে, রোমের সম্পর্কে একদিন আমরা যে অবস্থা লাভ করিয়াছিলাম। টিসিটাস আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, জুলিয়াস এগ্রিকোলো ব্রিটেনের প্রধান প্রধান লোকের পুত্রদিগকে রোমের সাহিত্য এবং বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার, তাহাদিগকে রোমক রুচি এবং শিক্ষা দ্বারা অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিবার নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহা যে কি চমৎকার ফল প্রসব করিয়াছিল তাহা আমরা সকলেই জানি। গোঁড়া শত্রু হইতে ব্রিটেনেরা রোমকদের বিশ্বস্ত মিত্রে পরিণত হইয়াছিল এবং ব্রিটেনদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে দৃঢ়তার সহিত রোমান আক্রমণ বাধা দিতে চেষ্টা করিয়াছিল তাহা অপেক্ষা বেশী দৃঢ়তার সহিত তাহারা চেষ্টা করিয়াছে রোমানদিগকে ব্রিটেনে রাখিবার জন্য।"—স্যার চার্লস ট্রেভেলিয়ান

"বর্ত্তমান আমরা এরূপ একটি সম্প্রদায় গড়িতেই চেষ্টা করিব যাহারা আমাদের কথা, যে কোটি কোটি লোককে আমরা শাসন করি তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে পারিবে। এই সম্প্রদায়টি রক্তে ভারতীয় হইবে কিন্তু রুচি, মত, চরিত্র এবং বুদ্ধিতে হইবে ইংরেজ।"—লর্ড মেকলে

ইংরেজের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় নাই। বৈদেশিক শিক্ষা ব্যবস্থায় সত্য সত্যই এদেশে কতকগুলি লোক আদশে চাল-চলনে ভাবে-ভঙ্গিতে বিদেশীই বনিয়া গিয়াছেন। সুতরাং বর্ত্তমান ভারতের গড়নে ইংরেজেরা যদি কোনো সাহায্য পাইয়া থাকেন তবে ইঁহাদের নিকট হইতেই পাইয়াছেন —সত্যকার কোনো ভারতবাসীর নিকট হইতে পান নাই। সত্য কথা বলিতে গেলে, এ কথাও স্বীকার করিতে হয় যে, ভয়েই হোক্ আর বিহ্বলতাতেই হোক্ তাঁহাদের এ প্রচেষ্টায় ভারতবাসীর নিকট হইতে কোনো বড় বাধা বা প্রতিবন্ধকতাও আসে নাই।

কিন্তু এ অবস্থারও আজ পরিবর্ত্তন সুরু হইয়াছে। অনেকদিন পরে হইলেও যাঁহারা ইংরেজী শিক্ষিত ভারতবাসী তাঁহারাও আজ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, দেশের নাড়ী হইতে তাঁহাদের যোগ ক্রমেই ছিন্ন হইয়া যাইতেছে এবং যে পথে তাঁহারা চলিয়াছেন সে পথ ঠিক চলিবার পথও নহে। বাঁচিতে হইলে ভারতবর্ষকে ভারতীয় বৈশিষ্ট্য, ভারতীয় সভ্যতার ধারায় অনুপ্রাণিত হইয়াই বাঁচিতে হইবে—ইংরেজের সঙ্গে আপনাকে মিশাইয়া দেওয়া তাহার চলিবে না। কারণ তাহাতে অধঃপতনের ও পরাধীনতার গভীরতম পঙ্কে নিমজ্জিত হওয়া ছাড়া আর কোনোই লাভ নাই। তাই তাঁহাদের ভিতরেও আজ সাড়া জাগিয়াছে ইংরেজের গড়া আবহাওয়া হইতে মুক্ত হইবার জন্য। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান

আন্দোলনকে স্বাধীনতা লাভের আন্দোলন নামই দিই আর স্বায়ত্ত-শাসন-লাভের আন্দোলন নামই দিই—আদতে তাহা ইউরোপীয় সভ্যতার প্রভাব হইতে মুক্তিলাভেরই আন্দোলন, নিজেদের বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্যের ভিতর ফিরিয়াই আসিবার আন্দোলন।

স্বরাজের সার্থকতা

আমাদের আন্দোলনের অন্তর্নিহিত এই রূপটা আমাদের কাছে ধরা পড়ুক আর নাই পড়ুক, কোনো কোনো ইংরেজের কাছে তাহার চেহারা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে তাই ডিব্রুগড়ের সেণ্ট-এণ্ড্রুজ ভোজ-সভার সভাপতি মিঃ চামার্শ বলিয়াছেন—"আমি যতদূর বুঝিতে পারি তাহাতে মনে হয়, ভারতবাসীরা যদি ঔপনিবেশিক শাসন-তন্ত্র লাভ করে তবে তাহাদের তাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা বড় যে লাভ হইবে সে লাভ তাহাদের মনের দিক দিয়া। মনের পরিবর্ত্তন তাহাদের সমস্ত জাতীয় চরিত্রকেই পরিবর্ত্তিত করিয়া দিবে। ১৫০ বৎসরের ব্রিটিশ শাসনে ভারতবর্ষের পার্থিব উন্নতি যে ঢের হইয়াছে তাহা কেহ অস্বীকার করে না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহা ভারতবাসী যে জাতি হিসাবে হীন এ ভাবটাও চারিদিকে ছড়াইয়া দিয়াছে। শিক্ষিত ভারত যে-কোনো রূপ ত্যাগ-স্বীকারের দ্বারা এই হীনতার ভাবটাই দূর করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন। তাঁহারা অনুভব করেন যে, সে জন্য প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য স্বরাজ বা ঔপনিবেশিক অধিকার লাভ করা—অর্থাৎ তাঁহার যে পরাধীন জাতি সেই কলঙ্ক দূর করা। তাঁহাদের বিশ্বাস, দেশের অধিকাংশ লোক যদি দেখে যে, তাহারা নিজেরাই দেশের কর্ত্তা

তবে তাহারা নিজেদের মনুষ্যত্বের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে, তাহাদের প্রাচীন সভ্যতাকে নূতন করিয়া গড়িতে পারিবে এবং জগতের জাতি সমূহের ভিতর প্রধান স্থানও গ্রহণ করিতে পারিবে।"

মিঃ চামার্স ঠিকই ধরিয়াছেন। জাতি তাহার বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলিয়াছিল বলিয়াই জাতির চেষ্টা আজ তাহার পুনরুদ্ধারের জন্য জাগিয়া উঠিয়াছে এই স্বাধীনতার আন্দোলনের আকারে। ব্রিটিশ ভারত ইংরেজ ও ভারতবাসীদের সহযোগিতায় গড়িয়া উঠে নাই, ভারতবর্ষকে ভাঙ্গিয়া ইংরেজেরা তাহাকে নিজেদের ছাঁচে ঢালিয়াই গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। আর সেই জন্যই আজিকার এই আন্দোলন ও অসন্তোষের সৃষ্টি।

কোনো জাতির ভিতর জাতীয়তার বোধ যখন জাগিয়া উঠে তাহার গতি তখন আর কেহই রোধ করিতে পারে না। তখন তাহার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না করিয়া, মিলনের সূত্র যাহাতে বজায় থাকে তাহার ব্যবস্থা করাই ভালো। ইংরেজ যে এ কথা জানে না তাহাও নহে। সেদিনও আয়রল্যাণ্ডের ভিতর দিয়া তাঁহারা ইহার পরিচয় পাইয়াছেন। মিঃ চামার্স তাঁহার বক্তৃতায় প্রকারান্তরে ঐরূপ একটা ইঙ্গিত দিতেও দ্বিধা করেন নাই। তাঁহার নিজের ভাষায় সে ইঙ্গিতটি এইরূপ :—"ভারতবাসীরা ঔপনিবেশিক শাসনাধিকার পাইলে আমাদের কি ক্ষতি? কোনোই ক্ষতি নাই। কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, বা আয়ারল্যাণ্ডের অধিকার লাভে আমাদের কোনোই ক্ষতি হয় নাই। ভারতবর্ষ ঔপনিবেশিক শাসনাধিকার পাইলেও আমাদের কোনো ক্ষতি হইবে না।"

তাঁহার এই ইঙ্গিতটি গ্রহণ করিলেই ইংরেজদের পক্ষে ঠিক করা হইবে বলিয়া মনে হয়। একটা বিরাট সত্যের সম্মুখে যাহারা মুখোমুখী হইয়া

দাঁড়ায়, ভয় বা প্রলোভনের বাধা তাহারা সঙ্গে সঙ্গেই পদদলিত করিয়া চলিবার শক্তিও অর্জ্জন করে। দেশাত্মবোধ তো তাহাই যাহা দেশের সত্য মূর্তিকে চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরে, যাহা দেশের সভ্যতা, শিক্ষা ও সাধনার প্রকৃতিকে নিজের ভিতরে অনুভব করিবার অধিকার দান করে। আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, আয়ারল্যাণ্ড এই ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই পরিচয় দিয়াছে যে, মুক্তির দাবীকে—জাতীয়তার দাবীকে কামান-বন্দুকের দ্বারা দাবাইয়া রাখা যায় না। ভারতবর্ষ অন্য ভাবে সেই একই সত্যের পরিচয় প্রদান করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। ভারতবর্ষের জাতীয় সাধনার ধারা আয়ারল্যাণ্ড, কানাডা প্রভৃতির ধারা হইতে বিভিন্ন, পশু-শক্তি অপেক্ষা আত্মার বলকেই ভারতবর্ষ বড় বলিয়া জানে। তাই আজ তাহার সাধনার ধারা ছুটিয়া চলিয়াছে পশুবলের অভিমুখে নহে—তাহার শক্তি সে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে আত্মিক বল অর্জ্জনের জন্য। ভারতবর্ষের সাধনা আত্মার এই শক্তিকে যদি জাগ্রত করিতে পারে তবে সঙ্গে সঙ্গে সে রাষ্ট্রীয় মুক্তিও যে লাভ করিবে তাহাতেও ভুল নাই।

ভারতের জাতীয় ঋণ

একটি প্রশ্ন উঠিয়াছে—ভারতবর্ষ যদি স্বাধীনতা লাভ করে, তবে তাহার জাতীয় ঋণের ব্যবস্থা কি হইবে? এ প্রশ্ন উঠিবার কারণও আছে। ভারতের রাষ্ট্র-নায়কেরা জানেন যে—দেউলিয়া ভারত স্বাধীনতা লাভ করিলেও স্বাধীনতার সুখ সে উপভোগ করিতে পারিবে না, যদি ঋণের ভার তাহাদের ঘাড়ে চাপানোই থাকে। ঋণ যে দেয় তাহাদের নিয়মই এই যে, যাহারা ঋণ করে প্রতি পদে সে তাহাদের উপর চোখ রাঙ্গাইতে থাকে। ঋণের দুঃখ যে কি প্রচণ্ড, বর্ত্তমানে জার্ম্মাণীর অবস্থার ভিতর দিয়া তাহার কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। এই জন্যই ভারতীয় সমাজ-কর্ত্তারা ঋণকে মৃত্যুর অপেক্ষা ভয়াবহ বলিয়া কল্পনা করিয়া গিয়াছেন।

ইংরেজের হিসাবে ভারতের জাতীয় ঋণের পরিমাণ ১,১০০ কোটি টাকারও বেশী। কেমন করিয়া এই অসম্ভব ঋণভার ভারতবর্ষের ঘাড়ে চাপিয়াছে তাহা লইয়া আলোচনা করিলে এ দেশটাকে যে কি ভাবে শোষণ করা হইতেছে তাহারও পরিচয় পাওয়া যায়। সমস্ত জাতিই ঋণ করে। কিন্তু তাহারা ঋণের টাকা দিয়া দেশের সম্পদই বাড়ায়। সুতরাং ঋণের অর্থ তাহাদের গায়ে বাধে না। কিন্তু ভারতবর্ষের শাসন-দণ্ড যাঁহাদের হাতে ছিল, তাঁহারা ঋণ করিয়াছেন অধিকাংশই ক্ষেত্রেই ভারতের নামে নিজের দেশের স্বার্থ পূরণের জন্য। যে ঋণ তাঁহাদের তাহারই বোঝা ভারতের ঘাড়ে চাপাইয়া তাঁহারা হাল্কা হইয়াছেন।

ভারতের ঋণ ভারতের অর্থ লইয়া ছিনি-মিনি খেলিবারই ইতিহাস। করাচী কংগ্রেস ভারতের ঋণ নির্ণয়ের যে কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিল তাঁহাদের রিপোর্টেও এই কথাই ধরা পড়িয়াছে।

ইংরেজেরা এ দেশে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে প্রায় পৌণে দুইশত বৎসর পূর্ব্বে। সেই সময় হইতেই এ দেশের শোষণ চলিতেছে, জাতীয় ঋণও সেই সময় হইতে সুরু হইয়াছে। ভারতের জাতীয় ঋণকে দুইটি বিশেষ ভাগে ভাগ করা যায় :—

(১) যে ঋণের সহিত ভারতের লাভের কোনো সম্পর্ক নাই, যাহা কেবল ইংলণ্ডের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত।

(২) যে ঋণের দ্বারা ভারত অল্পাধিক পরিমাণে লাভবান হইয়াছে।

ভারতের সমস্ত ঋণের ভিতর হইতে ৭২৯ কোটি টাকা ভারতের জাতীয় ঋণ নহে বলিয়া নিঃসংশয়েই বাদ দেওয়া যায়। পুঙ্খানুপুঙ্খ-ভাবে বিচার করিলে বাকি টাকার ভিতর হইতেও বেশ একটা বড় অংশই বাহির করিয়া যায়, ন্যায়তঃ যাহা ভারতের জাতীয় ঋণ বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না। কিন্তু তাহা না করিলেও যাহা ভারতের ঋণ নহে অথচ যাহা ভারত গবর্ণমেন্ট কেবল ইংলণ্ডের স্বার্থের জন্য ঋণ রূপে ভারতবর্ষের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়াছেন, তাহার অঙ্কটিও বিপুল। এই ৭২৯ কোটি টাকার ফিরিস্তি নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে—

যুদ্ধব্যয়—প্রথম আফগান যুদ্ধ, দুই বার্ম্মাযুদ্ধ,
চীন, পারস্য ও নেপাল অভিযান বাবদ ... ৩৫ কোটি টাকা

ভারতবর্ষের অধিকার ত্যাগ করার জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রাপ্য	...	৩৭	কোটি টাকা
সিপাহী বিদ্রোহের ব্যয় ...	...	৪০	কোটি টাকা

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের পর—

আবিসিনিয়ার অভিযান, দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ, মিশরের যুদ্ধ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের যুদ্ধ, ব্রহ্মের যুদ্ধ প্রভৃতি বাবদ	...	৩৭	কোটি	টাকা
ইউরোপায় যুদ্ধের জন্য দান	...	১৮৯	,,	,,
ইউরোপীয় যুদ্ধের খরচা	...	১৭১	,,	,,
ইণ্ডিয়া আফিসের খরচ, এডেনে, পারস্যে, চীনে বাণিজ্য-রাজ-প্রতিনিধি রাখার খরচ, রাজ-ধর্ম্ম রাক্ষার খরচ, ইত্যাদি	...	২০	কোটি	টাকা
ব্রহ্মদেশের বাবদ	...	৮২	,,	,,
মুদ্রা বিনিময়ের অব্যবস্থার জন্য	...	৩৫	,,	,,
রেল রাস্তার বাবদ	...	৮৩	,,	,,
		৭২৯	কোটি	টাকা

প্রত্যেকটি বিষয় যুক্তি এবং ন্যায়ের নিক্তিতে বিচার করিয়া দেখিলে বোঝা কঠিন হয় না যে, একান্ত গায়ের জোরেই এই বিপুল ঋণের ভার ভারতের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আফগান যুদ্ধে, বর্ম্মা যুদ্ধে অথবা ভারতের বাহিরে যেখানেই যুদ্ধ হইয়াছে ইংরেজের সাম্রাজ্য-বৃদ্ধির লিপ্সাই

ছিল তাহার কারণ। ভারতের স্বার্থের সহিত তাহার কোনো যোগ ছিল না, অথচ এজন্য যে ঋণ হইয়াছে তাহা চাপানো হইয়াছে ভারতের ঘাড়ে। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর হাত হইতে ইংলণ্ড এত বড় একটা রাজ্য লইল, প্রকাণ্ড এক সাম্রাজ্যের সে অধিপতি হইয়া বসিল, ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা, শোষণের সুবিধা করিয়া লইল, অথচ এই যে হস্তান্তর ইহার জন্য ৩৭ কোটি টাকা ঋণের ভার আসিয়া পড়িল ভারতেরই ঘাড়ে। সিপাহী বিদ্রোহের ব্যাপারটাও এইরূপ। ইংরেজের অত্যাচার-অবিচারের জন্য সিপাহীরা ক্ষেপিয়া উঠিয়া বিদ্রোহ করে, এবং এই দেশের লোকের সাহায্যেই সে বিদ্রোহ তাহারা দমন করে। দেশের লোকের এই সেবার প্রতিদানে তাহাদের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে ৪০ কোটি টাকার ঋণ। ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সঙ্গে ভারতবর্ষের কোথায় কোন্ যোগ ছিল? এই যুদ্ধে দুনিয়ার সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র দেশ ভারতবর্ষের নিকট হইতে ইংরেজ দান স্বরূপ লইয়াছে ১৮৯ কোটি টাকা এবং যুদ্ধের খরচা স্বরূপ লইয়াছে ১৭১ কোটি টাকা। ভারতের টাকার মা-বাপ নাই তাই ভারত গবর্ণমেণ্ট এত অর্থ নির্ব্বিবাদে খয়রাত করিয়াছেন—তাঁহার বিবেকে এজন্য কোথাও এতটুকু বাধে নাই। ভারতের মুদ্রা-বিনিময় ব্যবস্থা এক অদ্ভুত ব্যবস্থা। তাহার কোনো নির্দ্দিষ্ট বিধি-বিধান নাই—ইংলণ্ডের ব্যবসায়ীদের সুবিধার জন্য যখন যেরূপ খুশী সেইরূপ হার নির্দ্ধারিত করা হয়। আর তাহার জন্য ক্ষতি হয় দরিদ্র ভারতের—তাহার ঋণ-ভার বাড়িয়া উঠে। যে সব রেল-রাস্তা তৈরী হয় তাহার অনেক গুলি তৈরী হয় সৈন্য-সরবরাহের সুবিধার জন্য—ইংরেজের সাম্রাজ্য নিরাপদ রাখিবার জন্য। আর সে জন্য ঋণ-ভার বাড়িয়া ভারতের মাথায় জগদ্দল পাহাড়ের ন্যায় চাপিয়া বসে।

এইরূপ হিসাব ও যুক্তির দ্বারাই বুঝাইয়া দেওয়া যায় যে, উপরোক্ত ৭২৯ কোটি টাকা কোনো উপায়েই ভারতীয় জাতীয় ঋণের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। কংগ্রেস যাঁহাদের উপর বিচারের ভার দিয়াছিলেন এই কয় কোটি টাকার ঋণ তাঁহারাও অস্বীকার করিয়াছেন এবং চুল-চেরা যুক্তির দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে, ইহাদের কোনোটিই জাতীয় ঋণের তালিকা-ভুক্ত হইতে পারে না।

কমিটির সকল সদস্যই রিপোর্টের সম্পর্কে এক মত। কেবল শ্রীযুক্ত জে, সি, কুমারাপ্পা দুইটি বিশেষ মন্তব্য রিপোর্টের সহিত যোগ করিয়া দিয়াছেন। এই দুইটি মন্তব্যের প্রথমটি হইতেছে—সামরিক ব্যাপারে ভারতবর্ষের সম্পর্কে এ পর্য্যন্ত যত টাকা ব্যয় হইয়াছে, তাহা কেবল ভারতবর্ষের স্বার্থেই ব্যয় হয় নাই। সুতরাং যে টাকা ভারতবর্ষের জন্য ব্যয় হয় নাই, তাহা ফেরৎ পাওয়ার দাবীও ভারতবর্ষ করিতে পারে। এই সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ ২১,১২৮ কোটি টাকা। এই বিপুল অঙ্কের ভিতর হইতে শ্রীযুক্ত কুমারাপ্পা হিসাব করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে, অন্ততঃ ৫৪০ কোটি টাকা ভারতের ফেরৎ পাওয়া সঙ্গত।

তাঁহার দ্বিতীয় মন্তব্য—ভারতবর্ষ তাহার জাতীয় ঋণ নামে অভিহিত ব্যাপারটার সমস্ত সুদই এ পর্য্যন্ত বহন করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু হিসাব অনুসারে যাহা তাহার জাতীয় ঋণ নহে, তাহার সুদ সরবরাহ করার দায়িত্বও তাহার নহে। সুতরাং সুদের বাবদ যে বাড়্‌তি টাকাটা সে দিয়াছে তাহার তাহাও ফেরৎ পাওয়া উচিত। হিসাব করিলে এই অর্থের পরিমাণ অন্ততঃ ৫৩৬ কোটি টাকা হইবে।

ইংরেজেরা নাবালক ভারতবাসীর ট্রাষ্টি—এই কথাই তাঁহারা ঢাক-ঢোল পিটাইয়া জোর গলায় ঘোষণা করেন। কিন্তু এই ট্রাষ্টির দায়িত্ব তাঁহারা যে কি ভাবে প্রতিপালন করিয়াছেন জাতীয় ঋণের এই অপূর্ব্ব ব্যবস্থা দ্বারা তাহার একটা দিকের পরিচয় পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে দুই চারিজন ন্যায়-দর্শী ইংরেজের স্পষ্ট স্বীকার উক্তিও রহিয়াছে। এরূপ কথাও তাঁহাদের কেহ কেহ স্বীকার করিয়াছেন যে, "India is becoming feebler and feebler. The life-blood of the great multitude under our rule is slowly yet ever faster ebbing away." অর্থাৎ ভারতবর্ষ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া পড়িতেছে। আমাদের শাসনের আওতায় এই বিরাট জন-সঙ্ঘের জীবন-শোণিত ধীরে ধীরে অথচ দ্রুত গতিতে নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে।"—Bankruptcy of India—By H. M. Hyndman. বস্তুতঃ যে ঋণের ভার ভারতবর্ষের মাথায় তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাতে, যদি স্বাধীনতা পাওয়াও যায় তাহা হইলেও বিদেশী ঋণের দায় মিটাইতেই তাহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইবে—দেশের দুঃখ স্বাধীনতা পাইলেও ঘুচিবে না।

ভারতবর্ষ স্বাধীন থাকিলে তাহাকে হয়তো কোনো জাতির নিকট কোনো ঋণ করিতেই হইত না। কিন্তু সে স্বতন্ত্র কথা। এই সম্ভাবনার দোহাই দিয়া সত্য সত্যই ভারতবর্ষের জন্য ইংরেজ যে ঋণ করিয়াছে তাহা অস্বীকার করা চলে না। ভারতবর্ষ কেবল সেই ঋণের দাবীই অস্বীকার করিতে চায় যাহা ভারতবর্ষের নামে নিজের স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যেই ইংরেজেরা গ্রহণ করিয়াছেন—ভারতবর্ষের সত্যকার কল্যাণের সহিত যে ঋণের কোনো রকমের যোগ নাই।

শোষণের একটা দিক

দুর্ভিক্ষের হাতে এ দেশের লোক প্রত্যেক বৎসর মার খায়। এই মারের ভিতর দিয়া এ দেশের লোকের দুঃখের অবস্থা—দুর্দ্দশার অবস্থা পরিস্ফুট হইয়া উঠে। বস্তুতঃ এত বড় দরিদ্র দেশ এ দুনিয়ায় আর দু'টি আছে কিনা সন্দেহ।

দারিদ্র্য অন্যান্য দেশে সাধারণতঃ দেখা দেয় অকস্মাৎ এবং আকস্মিক বিপদপাতে। কিন্তু এ দেশে দারিদ্র্য নিত্যকার বস্তু। তাহার প্রধান কারণ শোষণ। এ শোষণ চলে বিদেশী বণিকদের মারফৎ এবং এ দেশের শাসন-ব্যবস্থার ভিতর দিয়া। বস্তুতঃ শাসন-ব্যবস্থা যদি দেশের দরদে দরদী হইত তবে বণিকদের শোষণও বন্ধ করা যাইত। কিন্তু শাসন-ব্যবস্থাই যখন শোষণের বনিয়াদের উপর গঠিত, তখন তাহাদের হাতে যে যন্ত্র রহিয়াছে তাহা শোষণ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে কেনই বা ব্যবহৃত হইবে?

ভারতের শোষণের স্বরূপ সকল ভারতবাসীরই জানিয়া রাখা দরকার। ইংরেজদের নিজেদের কথাতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। মিঃ Brook Adams তাঁহার Law of Civilisation and Decay নামক গ্রন্থে হিসাব দিয়াছেন পলাসীর যুদ্ধ হইতে ওয়াটার্লুর যুদ্ধ পর্য্যন্ত ৫৭ বৎসরে ভারতবর্ষকে শোষণ করিয়া ইংলণ্ড যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছে তাহার পরিমাণ ৫০ কোটি পাউণ্ড হইতে ১০০ কোটি পাউণ্ডের মধ্যে। পাউণ্ডের মূল্য ১৩ টাকা করিয়া ধরিলেও এই অঙ্কটির পরিমাণ

হয় ৬৫০ কোটি হইতে ১৩০০ কোটি টাকা। ওয়েষ্ট মিনিষ্টার গেজেটের হিসাব অনুসারে ১৮৭৫ হইতে ১৯০০ সাল পর্য্যন্ত ২৫ বৎসরে ভারতের অন্যূন ৫০ কোটি পাউণ্ড অর্থাৎ ৬৫০ কোটি টাকা ইংলণ্ডের কুক্ষিগত হইয়াছে।

মিঃ ডিগবি উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত এই হিসাবের একটা মোটামুটি ঠিক নামাইয়াছিলেন। হিসাবে তাঁহার অঙ্কটি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ৬০৮ কোটি পাউণ্ড অর্থাৎ ৭৯০৪ কোটি টাকায়। এই অঙ্কের সহিত গত ৩০ বৎসরের শোষণের পরিমাণটা যোগ দিলে ইংলণ্ডের শোষণের সম্পূর্ণ অঙ্কটা ধরা পড়ে। ভারতের বাৎসরিক শোষণের পরিমাণ সম্বন্ধে অবশ্য অর্থ-নীতি-বিদ্‌দের মতদ্বৈধ আছে। কেহ বলেন উহার পরিমাণ বাৎসরিক ৪ কোটি পাউণ্ড, কেহ্ বা বলেন সাড়ে তিন কোটি পাউণ্ড, আবার কেহ বা বলেন ২ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড। ২ কোটি করিয়া ধরিলেও ৩০ বৎসরে ৬০ কোটি পাউণ্ড অর্থাৎ ৭৮০ কোটি টাকা হয়। সুতরাং কত বড় শোষণ যে দেশের বুকের উপর দিয়া চলিতেছে তাহা সহজেই অনুমেয়।

ভারতবর্ষকে শোষণ করিবার যতগুলি পথ আছে গবর্ণমেণ্টের বড় বড় চাকুরীগুলি তাহার অন্যতম। বলা বাহুল্য বড় চাকুরীয়াদের বেশীর ভাগই বিলাতের আমদানী। তাঁহারা এদেশে আসেন, দেশের লোককে অসভ্য বর্ব্বর মনে করিয়া শাসন করেন, এবং শাসনের সঙ্গে সঙ্গে পকেট ভর্ত্তি করিয়া দেশে ফিরিয়া যান। গবর্ণমেণ্টের দুই একটি বিভাগের কর্ম্মচারীদের মাহিয়ানার দিকে তাকাইলেই এদিক দিয়া শোষণের বহরের পরিচয় পাওয়া যায়।

এ দেশের বড় লাটের মাহিয়ানা মাসিক ২০,৯০০ টাকা অর্থাৎ বার্ষিক আড়াই লক্ষ টাকা। ৯টি বড় প্রদেশ আছে—তাহাদের গবর্ণরদের মাহিয়ানা মাসিক দশ হাজার হইতে মাসিক সাড়ে পাঁচ হাজার পর্য্যন্ত। বাৎসরিক ইঁহাদের মাহিয়ানা বাবদ ভারতবর্ষকে দিতে হয় প্রায় সোয়া নয় লক্ষ টাকা।

৬টি প্রদেশ চিফ কমিশনারদের দ্বারা শাসিত হয়। তাঁহাদের মাহিয়ানা মাসিক সাড়ে পাঁচ হইতে চারি হাজার টাকা। সুতরাং তাঁহাদের মাহিয়ানা বাবদ বাৎসরিক দিতে হয় ২,৮২,০০০৲ টাকা।

কমেণ্ডার-ইন-চিফ—প্রধান সেনাপতির মাহিয়ানা মাসিক ৮৩৩৩ টাকা, অর্থাৎ বাৎসরিক ১ লক্ষ টাকা।

সাতটি প্রদেশ হাইকোর্টের অধীনে। তাহাদের প্রধান বিচারপতিদের মাহিয়ানা মাসিক ৬ হাজার হইতে ৫ হাজার টাকা অর্থাৎ তাঁহাদের বাৎসরিক মাহিয়ানার পরিমাণ ৪,৩২ হাজার টাকা। হাইকোর্টে বিচারপতি আছেন ৯৭ জন। তাঁহাদের প্রত্যেকের মাহিয়ানা মাসিক ৪০০০ টাকা। অর্থাৎ বৎসরে ইঁহাদিগকে দিতে হয় সাড়ে ছয় চল্লিশ লক্ষ টাকা।

বড় লাটের শাসন-পরিষদে ছয়জন সদস্য আছেন যাঁহাদের প্রত্যেকের মাহিয়ানা মাসিক ৬,৬৬৭ টাকা। এই বড় লাটের দপ্তরেই পাঁচ হাজার টাকা হইতে তিন হাজার টাকা পর্য্যন্ত মাহিয়ানা পান এমন কর্ম্মচারী অন্ততঃ ৫০ জন আছেন।

প্রাদেশিক শাসন পরিষদের বা আইন পরিষদের যাঁহারা ৫ হাজার টাকার উপরে মাহিয়ানা পান তাহাদের সংখ্যা অন্ততঃ ৩৫ জন। তাহা ছাড়া সরকারী চাকুরিয়াদের ভিতর হাজারী, দুই হাজারী, তিন হাজারী চাকুরিওয়ালার সংখ্যা গুণিয়া পাওয়াই ভার।

অন্যান্য দেশের কথা ছাড়িয়া দিয়াও যদি কেবলমাত্র ইংলণ্ডের কথা ধরা যায়, অর্থাৎ যে দেশ এ দেশের ঘাড়ে এই বিপুল মাহিয়ানার বোঝা চাপাইয়া দিয়াছে কেবলমাত্র তাহার কথাই ধরা যায় তাহা হইলেও ইহার অদ্ভুত বিসদৃশ্যের চেহারাটা ধরা পড়ে। ইংলণ্ডের রাজ-সরকারে সর্ব্বাপেক্ষা বড় ও দায়িত্বপূর্ণ চাকরী হইতেছে প্রধান মন্ত্রীর। এই প্রধান মন্ত্রী বৎসরে মাহিয়ানা পান ৫০০০ পাউণ্ড। ১৩ টাকা করিয়া পাউণ্ডের দাম ধরিলে টাকায় এই অঙ্কটির পরিমাণ হয় ৬৫ হাজার টাকা। লাট-বে-লাটের কথা ছাড়িয়া দিই, এদেশের শাসন-পরিষদের অনেক সভ্যের মাহিয়ানাও ইহা অপেক্ষা ঢের বেশী।

ইংলণ্ডের সৈন্য-শক্তি বিপুল, তাহার উদ্যত সঙ্গীন সমস্ত দুনিয়াকে সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে। এই ইংলণ্ডের যিনি First Lord of Admiralty তাঁহার মাহিয়ানা বৎসরে ৫৮,৫০০ টাকা এবং তাহার যুদ্ধ-সচিবের মাহিয়ানা বৎসরে ৬৫,০০০ টাকা। অথচ ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতির মাহিয়ানা বৎসরে লক্ষ মুদ্রা।

বিলাতের পার্লামেন্টের দপ্তরে পাঁচ হাজার পাউণ্ডের চাকুরী গোটা দশ-বারোর বেশী নাই। কিন্তু ভারতবর্ষে যাঁহারা বৎসরে ৬০ হাজার টাকা মাহিয়ানা পান এমন লোকের সংখ্যা অন্ততঃ তাহার পাঁচ গুণ বেশী হইবে তাহাতে তো কোনো সন্দেহই নাই। সকলেই জানে—ভারতবর্ষ দুনিয়ার দরিদ্রতম দেশ, এবং অর্থের দিক দিয়া একমাত্র আমেরিকাকে বাদ দিলে ইংলণ্ডের জোড়া নাই। সেই ইংলণ্ডের সরকারী কর্ম্মচারীদের মাহিয়ানার সঙ্গে দরিদ্র ভারতের মাহিয়ানার যখন তুলনা করা যায় তখন ভারতের সমস্ত ব্যবস্থা যে কি অদ্ভুত অসামঞ্জস্যের ভিতর দিয়া চলিয়াছে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

বস্তুতঃ এই জন্যই প্রতি মুহূর্ত্তে গবর্ণমেণ্টের ধন-ভাণ্ডারে এত অর্থের অভাব লাগিয়া থাকে—বাজেট লইয়া ব্যবস্থাপক সভায় হানাহানি ও তর্ক-বিতর্কের অন্তই থাকে না। অট্টালিকার মাথা যদি ভারি হয়, এবং ভিত্তি যদি হাল্‌কা হয় তবে নিজের ভারেই সে প্রাসাদ ভাঙ্গিয়া পড়ে। ভারতের এই শাসন-দণ্ডের প্রাসাদও এতদিন ভাঙ্গিয়া পড়িত, কেবল ঋণের প্যালা ঠেকাইয়া কোনো রকমে তাহাকে দাঁড় করাইয়া রাখা হইয়াছে।

রাষ্ট্রীয় মহাসমিতিতে ১৯৩১ সালে যে সমস্ত প্রস্তাব পাশ হইয়াছে তাহার ভিতর একটি প্রস্তাব ছিল স্বাধীন ভারতে কোনো সরকারী কর্ম্মচারীর মাহিয়ানাই ৫০০ টাকার বেশী হইতে পারিবে না। প্রস্তাবটির সার্থকতা যে কোথায়, ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার দিকে এবং তাহার সরকারী কর্ম্মচারীদের মাহিয়ানার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা বোঝা যায়। মাহিয়ানার এই উচ্চ হারের ভিতর দিয়া যে অদ্ভূত অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে সে অবস্থার প্রতিকারের পথ সবটা না হোক্ কতকটা যে এই ব্যবস্থার ভিতর আছে তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই।

ভারতকে মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য বিদেশী বণিকের শোষণ বন্ধ করা যেমন দরকার, সরকারী কর্ম্মচারীদের দ্বারা যে শোষণ চলিয়াছে তাহাও বন্ধ করা তেমনি দরকার। স্বাধীন দেশগুলির আয়ের সঙ্গে ভারতের আয়ের এবং সেই আয়ের অনুপাতে বিভিন্ন দেশের রাজকর্ম্মচারী-দের মাহিয়ানার তুলনা করিলে ভারতবর্ষ তাহার উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী-গণকেও ৫০০ টাকার বেশী মাহিয়ানা দিতে পারে না।

বস্তুতঃ আজ যে সব রাজ-কর্ম্মচারী ভারতের হাজার হাজার টাকা লইয়া এই দরিদ্র দেশকে শোষণ করিতেছেন কংগ্রেসের এই প্রস্তাবের

নিক্তিতে তাঁহাদের নিজেদের শোষণের গুরুত্বটা মাপিয়া দেখা দরকার, এবং ভারতবর্ষ স্বাধীন না হওয়া পর্য্যন্ত যাঁহারা তাহার শাসনদণ্ড আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছেন তাঁহাদেরও কর্ত্তব্য মাহিয়ানার তালিকাটা এই নিক্তির ওজনেই আগাগোড়া পাল্‌টাইয়া ফেলা। কংগ্রেস-সিদ্ধান্ত কেবল দেশের ভবিষ্যৎ শাসন-ব্যবস্থারই নির্দ্দেশ করে নাই, অতি-ভার-পীড়িত বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টকেও ভাবিবার, নিজেদিগকে সংস্কৃত করিবার একটা সুযোগ দিয়াছে।

কংগ্রেসের ইঙ্গিত

এ দেশের শাসন-তন্ত্র, শোষণের যে কত বড় যন্ত্র পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা তাহার পরিচয় দিয়াছি, আর সেই সঙ্গে দেখাইয়াছি যে, ইংলণ্ডের সহিত তুলনা করিয়াও এ সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যায়। কিন্তু ইংলণ্ডই যে এ সম্পর্কে আদর্শ—এ কথাও কেহ যেন মনে না করেন। বস্তুতঃ পাশ্চাত্য জগত ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধার স্বপ্নে আজ এমন ভাবেই মশ্‌গুল হইয়া আছে যে, দেশের সেবা যাঁহারা করেন, তাঁহারাও নিজেদের স্বার্থের কথাটা আগে মনে রাখিয়া তারপর ভাবেন দেশের কথা। রাজা প্রজার সেবক এবং প্রজার নিকট হইতে যে অর্থ সংগ্রহ করা হয় তাহা প্রজার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যই ব্যয়িত হইবে—তাহার ভিতর হইতে ভরণ-পোষণের অধিকার ছাড়া রাজার আর কিছু গ্রহণ করিবার অধিকার নাই—রাজ-শক্তি নিয়ন্ত্রণের এই যে সত্যকার আদর্শ, বর্ত্তমান জগৎ সে কথা প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছে।

বস্তুতঃ ইংলণ্ডের শাসন-তন্ত্রও যে শোষণের ভারে উৎপীড়িত তাহার পরিচয়ও আজ অস্পষ্ট নহে। ব্যবস্থা অনুসারে কাজ করিতে গিয়া সেখানেও অর্থাভাবে এমনি হানাহানি হয়, অথচ শাসন যাঁহারা করেন, মোটা মাহিয়ানায় তাঁহাদের পকেটগুলি মাসের পর মাস একই ভাবে ভারি হইয়া উঠিতে থাকে। এই অবস্থা যে ইংলণ্ডের কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে সম্প্রতি লেবার-গবর্ণমেণ্টের পতনের ভিতর দিয়া তাহার একটা আভাস

পাওয়া যায়। অচল গবর্ণমেণ্টকে তাঁহারা কর বসাইয়া সচল করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তবু রাজ-কর্ম্মচারীরা মোটা মাহিয়ানার লোভ ছাড়িতে পারেন নাই। নূতন ক্যাবিনেট মাহিয়ানা কমাইবার একটা ব্যবস্থা করিয়াছেন বটে, কিন্তু কমাইয়াও যাহা আছে তাহাও ঢের বেশী। সভ্যতার বিষ এমনি করিয়া সমাজ-দেহের ভিতর সঞ্চারিত হইতেছে।

কিন্তু সে যাহাই হোক্, অন্যান্য স্বাধীন দেশে শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে তবু খানিকটা হাত প্রজার আছে যাহার ফলে কর্ত্তৃপক্ষ শোষণের ব্যাপারে মাত্রা লঙ্ঘন করিতে পারেন না—আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের একটা সামঞ্জস্য রাখিবার দিকে অন্ততঃ তাঁহাদের দৃষ্টি থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষে এ সম্বন্ধে শাসন-কর্ত্তারা একেবারে নিরঙ্কুশ।

আরো দুই একটি স্বাধীন দেশের সরকারী কর্ম্মচারীদের মাহিয়ানার সঙ্গে এ দেশের কর্ম্মচারীদের মাহিয়ানার তুলনা করিলে এ সম্বন্ধে আরও নিঃসংশয় হওয়া যায় এবং কংগ্রেসের মাসিক ৫০০৲ টাকা মাহিয়ানার প্রস্তাবটি যে কংগ্রেস-সভ্যদেব খেয়াল মাত্র নহে, তাহারও পরিচয় সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। নিম্নে জাপানের ও ভারতবর্ষের রাজ-কর্ম্মচারীদের মাহিয়ানার একটা তুলনা-মূলক হিসাব দেওয়া গেল ঃ—

	জাপান বৎসরে	ভারতবর্ষ বৎসরে
গবর্ণর জেনারেল	১০,৭৬০ টাকা	২,৫০,০০০ টাকা
গবর্ণর	৯,৬০০ টাকা	১,২০,০০০ টাকা
সেক্রেটারিয়েটে সর্ব্বোচ্চ মাহিয়ানা	৬,০০০ টাকা	৮০,০০০ টাকা
প্রধান বিচারপতি	১২,০০০ টাকা	৬০,০০০ টাকা

জাপানের জন-সাধারণের দৈনিক আয় চারি আনা, এবং ভারতের জন-সাধারণের আয় দিনে ছয় পয়সা মাত্র। সুতরাং সরকারী কর্ম্মচারীদের মাহিয়ানার নির্দ্দেশে এ দেশে যে কত বড় একটা ব্যভিচার চলিতেছে তাহা সহজেই অনুমেয়।

ভারতের শাসন-ব্যবস্থার উচ্চ পদগুলির অধিকাংশ ইংরেজদের দ্বারাই অধিকৃত হইয়া আছে সে কথা পূর্ব্বের প্রবন্ধে বলিয়াছি। এখানে এই ভাগ-বাটোয়ারার একটা তালিকা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। এই তালিকাটি তৈরী করিয়াছেন বিখ্যাত অর্থ-নীতি-বিদ্ মিঃ কে-টি-শ।

চাকুরীর ভাগ-বাটোয়ারা

মাহিয়ানার পরিমাণ	ইংরেজ	ভারতীয়	অ্যাংলোইণ্ডিয়ান
২০০৲—৩০০৲	শতকরা ১২ জন	শতকরা ৬৪ জন	শতকরা ২৪ জন
৩০০৲—৪০০৲	,, ১৯ ,,	৬২ ,,	,, ১৯ ,,
৪০০৲—৫০০৲	,, ৩৬ ,,	৪৯ ,,	,, ১৫ ,,
৫০০৲—৬০০৲	,, ৫৮ ,,	৩১ ,,	,, ১১ ,,
৬০০৲—৭০০৲	,, ৫৪ ,,	৩৬ ,,	,, ১০ ,,
৭০০৲—৮০০৲	,, ৭৮ ,,	১৪ ,,	,, ৮ ,,
৮০০৲—৯০০৲	,, ৭৩ ,,	২১ ,,	,, ৬ ,,
৯০০৲—১০০০৲	,, ৯২ ,,	৪ ,,	,, ৪ ,,

অতঃপর একথা বলা হয় তো অন্যায় হইবে না যে, ইংরেজদের স্বার্থের জন্যই মাহিয়ানার হার অত উচ্চ রাখা হইয়াছে। যাঁহারা স্পষ্ট-বক্তা

ইংরেজ, এ সম্বন্ধে তাঁহাদের উক্তিও খুবই সুস্পষ্ট। তাঁহারা সোজাসুজি ভাবেই এ কথা বলেন যে, ভারতবর্ষের উপকারের জন্য তাঁহারা ভারতবর্ষকে জয় করেন নাই, ইংলণ্ডের স্বার্থের জন্যই তাঁহারা ভারতবর্ষকে অধিকার করিয়া আছেন। ইহাই যেখানকার মনোভাব সেখানে এ আশাও করা যায় না যে, ভারতের দুঃখ ও দুর্দ্দশার অবস্থা দেখিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহার শোষণের পথগুলি বন্ধ করা হইবে। সে জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে স্বাধীন ভারতের।

কিন্তু তাহার পূর্ব্বে যে কোনো কাজ করা যায় না তাহা নহে। শাসন-যন্ত্র যাঁহারা পরিচালনা করিতেছেন তাঁহাদের বেশীর ভাগ ইংরেজ হইলেও সকলেই ইংরেজ নহেন। তাঁহাদের ভিতর ভারতবাসীও অনেক আছেন এবং তাঁহারাও এই শোষণের অর্থে পকেট ভর্ত্তি.করিতেছেন। যাঁহারা এরূপ ভাবে অর্থ উপার্জ্জন করেন, তাঁহারা তাঁহাদের প্রয়োজনীয় অর্থ মাত্র রাখিয়া বাদ-বাকী সমস্তটাই দান করিতে পারেন দেশ-হিত-ব্রতে। 'প্রয়োজন' শব্দটি এখানে পাশ্চাত্য সভ্যতার মাপ-কাঠিতে মাপিলে চলিবে না। কারণ সেখানে তাহার উদরের গর্ত্ত এত বৃহৎ যে, নিখিল দুনিয়ার সম্পদ আনিয়াও যদি তাহাতে নিক্ষেপ করা যায় তবু তাহার ভরিবার সম্ভাবনা নাই। অত্যন্ত নিকৃষ্টতম ব্যসন যাহা তাহাও সেই মাপ-কাঠিতে প্রয়োজনের পংক্তিতে আসিয়া দাঁড়ায়। এই জন্য 'প্রয়োজন' বলিতে তাহার পরিধি যাহা জীবন-ধারণের জন্য একান্ত আবশ্যক কেবল মাত্র সেই সব জিনিষের সমষ্টিতেই নিষিদ্ধ করিতে হয়।

কংগ্রেস এ সম্বন্ধে সমস্ত সংশয় এক কথায় মিটাইয়া দিয়াছেন। কি যে প্রয়োজন আর কি যে অপ্রয়োজন, তাহা লইয়া তাঁহারা কোনো কথা

কাটাকাটি করেন নাই ; তাঁহারা নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, পাঁচ শত টাকার বেশী লাট-বেলাটেরও মাহিয়ানা হইতে পারিবে না। প্রয়োজন, সে যত বড় লোকই হোক্, এই অর্থের ভিতর সকলকেই মিটাইয়া লইতে হইবে। কংগ্রেসের এই ইঙ্গিত মানিয়া লইয়া যাঁহারা প্রয়োজনের বেশী মাহিয়ানা পান তাঁহাদের উদ্বর্ত্ত অর্থ যদি তাঁহারা দেশ-হিতকর কার্য্যে দান করেন, তবে হয় তো তাঁহাদের পক্ষে কতকটা প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে।

বস্তুতঃ আজই এই প্রস্তাব পাশ করার মূলে কংগ্রেসের যে এই ধরণের একটা উদ্দেশ্য নাই তাহাও বলা যায় না। দেশকে স্বরাজের জন্যই তাঁহারা প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। সে স্বরাজ কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতা নহে, সে স্বরাজ তাহাই যাহা স্বাধীনতা তো আনেই, সঙ্গে সঙ্গে যাহা আর্ত্তের আর্ত্তি দূর করে, যাহারা নিরন্ন তাহাদিগকেও অন্ন দেয়। এ জন্য তো দেশকে ত্যাগের উপরেই প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, তাহার জনগণকে লোভ হইতেই —স্বার্থ হইতেই মুক্ত হইতে হইবে। কেবল তোমার আমার নহে— জাতির সকলের চিন্তা-কেন্দ্রের পরিবর্ত্তনের দ্বারাই সে স্বরাজ আসিতে পারে। সুতরাং রাজ-তন্ত্রে কাহারো মাহিয়ানা পাঁচ শত টাকার বেশী হইবে না—এই সিদ্ধান্তের দ্বারা তাঁহারা ভারতের হাজার হাজার টাকা যাঁহারা মাহিয়ানা বাবদ শোষণ করিতেছেন তাঁহাদিগকেও যে আহ্বান করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

কথাটা আরও সুস্পষ্ট হইয়াছে 'ইয়ং-ইণ্ডিয়া'তে প্রকাশিত গান্ধীজীর 'আমরা আজই কি বলিতে পারি' প্রবন্ধটি হইতে। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন —"গবর্ণমেণ্টের উপর জাতীয় কর্ত্তৃত্ব লাভ প্রকৃত পক্ষে আমাদের নিজেদের কর্ত্তব্য পালনের উপরেই নির্ভর করে। আজ যাহা আমাদের করা কর্ত্তব্য

তাহা যদি আমরা না করি, যখন শক্তি আমাদের হাতে আসিবে তখনও আমরা তাহা করিতে পারিব না। * * * নিজেদের আয়ের একটা নির্দ্ধারিত অংশ যদি আমরা জাতীয় কাজের জন্য দান না করি, স্বেচ্ছায় নিজেদের মাহিয়ানা না কমাই, অথবা নিজেদের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা কম ব্যয় করিয়া মাহিয়ানার বাদ-বাকী অংশ জাতীয় কাজের উদ্দেশ্যে ব্যয় না করি * * * তবে আমি ভবিষ্যৎ বাণী করিতে পারি যে, অনিচ্ছুক জন-গণের দ্বারা রাষ্ট্র-শক্তিও এ সমস্ত সংস্কার সাধন করিতে পারিবেন না।"

কংগ্রেসের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। অতি-শোষণের চাপে দেশ নিঃস্ব, রিক্ত, শূন্য-গর্ভ। এই শোষণ-নিঃস্ব দেশের অর্থ যাঁহারা পাওনার অতিরিক্ত গ্রহণ করেন, তাঁহারা অন্যায় করেন। কংগ্রেস তাঁহাদের সকলকেই আহ্বান করিতেছেন—তাঁহাদের বিলাসের বহর কমাইয়া ফেলিবার জন্য, প্রজার অর্থ শোষণ করিয়া তাঁহারা যে অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন তাহা অন্যায় ভাবে ব্যবহার না করিবার জন্য এবং উদ্বৃত্ত অর্থ জাতীয় কাজে ব্যয় করিবার জন্য।

সামরিক ব্যয়

কোন্ দেশ সৈন্য বিভাগের জন্য কত ব্যয় করে 'উইক' হইতে নিম্নে তাহার একটা তালিকা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। অঙ্কগুলি সমস্তই কোটি ফ্রাঙ্কের হিসাবে। যে সব দেশের সামরিক ব্যয় ১০ কোটি ফ্রাঙ্কের কম তাহাদের নাম এই তালিকায় ধরা হয় নাই।

দেশ		কোটি ফ্রাঙ্ক	দেশ		কোটি ফ্রাঙ্ক
ইউনাইটেড ষ্টেটস্	...	১৭৬৩	সুইটজারল্যাণ্ড	...	৪৯
রাশিয়া	...	১৪৪৭	অষ্ট্রেলিয়া	...	৪৬
ফ্রান্স	...	১১৬৭	তুরস্ক	...	৪৩
গ্রেট ব্রিটেন	...	১১৬৩	ফিণল্যাণ্ড	...	৪১
ইটালী	...	৬২২	পর্ত্তুগাল	...	৪০
জাপান	...	৫৯২	অষ্ট্রিয়া	...	৩৬
ভারতবর্ষ	...	৫২৯	ডেনমার্ক	...	৩০
জার্ম্মানী	...	৪২৯	কিউবা	...	৩০
স্পেন	...	২৮১	নরওয়ে	...	২৮
পোল্যাণ্ড	...	২৩০	ইজিপ্ট	...	২৬
ব্রেজিল	...	১৩৭	পার্শিয়া	...	২৪
রোমানিয়া	...	১৩৪	পেরু	...	২৪
জেকোশ্লভকিয়া	...	১২৮	শ্যাম	...	২৩

জুগ শ্লভিয়া	...	১২৬	ইউরুগুয়া	...	২১
আর্জ্জেণ্টাইন	...	১২৫	জেটল্যাণ্ড	...	১৯
মেক্সিকো	...	১১৫	বুলগেরিয়া	...	১৯
সুইডেন	...	৯৯	কোলাম্বিয়া	...	১৬
বেলজিয়াম্	...	৮৩	ভেনিজুয়েলা	...	১৫
নিদারল্যাণ্ডস্	...	৭৭	লিথুয়ানিয়া	...	১৪
গ্রীস	...	৫৩	ইষ্টোনিয়া	...	১৩
হাঙ্গারী	...	৫০	দক্ষিণ-আফ্রিকা	...	১২

এই তালিকা হইতে পাঠকেরা দেখিতে পাইবেন যে বিশ্ব-রাষ্ট্র-সঙ্ঘের নিরস্ত্রীকরণের স্বপ্ন এখনও স্বপ্নের কোঠাতেই রহিয়া গিয়াছে—বাস্তবের ক্ষেত্রে তাহার এতটুকুও মূল্য নাই। বস্তুতঃ প্রত্যেক শক্তিই যেখানে বিশ্ব-গ্রাসী ক্ষুধা অন্ধ পশুবলের দ্বারা মিটাইবার জন্ত ব্যস্ত হইয়া আছে এবং সেজন্ত দুর্ব্বলকে শোষণ করার পথই বাছিয়া লইয়াছে সেখানে এই রকমই হয়। সেখানে যুদ্ধোপকরণ কমে না, তাহা বাড়িতেই থাকে। অবশেষে বাড়িতে বাড়িতে তাহার মাথা এতই ভারি হইয়া উঠে যে, ভারের চাপে অবশেষে তাহা নিজেদের ঘাড়েই ভাঙ্গিয়া পড়ে। মহাভারতকার কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বিরাট ক্ষাত্র-শক্তির ধ্বংসের দ্বারা এই কথাই প্রমাণ করিয়াছেন—গত ইউরোপীয় মহাসমরেও তাহার কতকটা পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। উক্ত যুদ্ধের অবসানে ইউরোপও হয় তো এই শোচনীয় পরিণামের কথাটা ধরিতে পারিয়াছিল এবং সেই কথা মনে করিয়াই নিরস্ত্রীকরণের প্রশ্নটার উদ্ভব হয়তো সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু গোড়ায় যাহার গলদ রহিয়াছে লোভ সেখানে শুভ বুদ্ধিকে জাগ্রত হইতে দেয় না—এবং শুভ বুদ্ধি জাগ্রত হইলেও

তাহা কার্য্যে পরিণত করার কালে বিপরীত বুদ্ধিরই সৃষ্টি হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সভ্যতার মূলে যে লোভ, যে স্বার্থ-বুদ্ধি, যে ভোগ-স্পৃহা রহিয়াছে শাশ্বত কল্যাণের পথ তাহাই রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। এই সভ্যতার ধাঁচ যদি বদলানো না যায় সমস্ত শুভ সঙ্কল্পই তাহার এই ভাবেই ব্যর্থ হইবে।

কিন্তু এইবার বিশ্ব-রাষ্ট্রের কথা ছাড়িয়া ভারতবর্ষের কথায় আসা যাক্। ভারতবর্ষের সামরিক ব্যয় ভারতবর্ষের সম্পর্কে যে কত বড় জুলুম এই হিসাবটার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। দুনিয়ার অনেকগুলি দেশ—যাহাদের প্রতিষ্ঠা রাষ্ট্র-সঙ্ঘে সামান্য নয়, সৈন্য বিভাগের জন্য তাহারা যাহা ব্যয় করে তাহার পরিমাণ ভারতবর্ষের অপেক্ষা বেশী নয়। তুলনা স্বরূপ জার্ম্মাণীর কথা ধরা যায়, তুরস্কের কথা ধরা যায়। জার্ম্মাণী ভারতবর্ষের অপেক্ষা প্রায় ১০০ কোটি ফ্রাঙ্ক তাহার সৈন্য বিভাগের জন্য কম ব্যয় করে। তুরস্কের অপেক্ষা ভারতের সৈন্য-বিভাগের ব্যয় অন্ততঃ ১২ গুণ বেশী—অথচ ইহারা উভয়েই প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্র-শক্তি। কিন্তু রহস্যটা সব চেয়ে অদ্ভুত ভাবে ধরা পড়ে জাপানের সঙ্গে তুলনায়। এই উভয় দেশের সামরিক ব্যয় প্রায় সমান—জাপানের সামান্য কিছু বেশী। অথচ দুই রাষ্ট্রের শক্তির ভিতর কত তফাৎ! জাপানের বিরাট নৌ-বহর—সে নৌ-বহর ইংলণ্ডের নৌ-বহরের সঙ্গেও টক্কর দিবার স্পর্দ্ধা রাখে। কিন্তু তিনটা দিক জলে ঘেরা হইলেও ভারতের নৌ-বহর নাই—সেজন্য তাহার নির্ভর করিতে হয় ইংলণ্ডের উপরে। সৈন্য বিভাগের জন্য ৫৯২ কোটি ফ্রাঙ্ক ব্যয় করিয়া জাপান দুনিয়ার রাষ্ট্র-সঙ্ঘগুলির হুম্‌কিকেও তুড়ি দিয়া উড়াইয়া দেয়, আর ৫২৯ কোটি ফ্রাঙ্ক ব্যয় করিয়াও ভারত তাহার স্বাধীনতা অর্জ্জনের যোগ্যতা লাভ করিতে পারে না!

আর একটা দিক দিয়া বিচার করিলেও ভারতের সামরিক ব্যয় যে কত বড় একটা অদ্ভুত ব্যবস্থা তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এ দিকটা রাজস্বের দিক। আয়ের অনুপাতে ব্যয়—যাহারা টি'কিয়া থাকিতে চায় তাহাদেরই সনাতন পদ্ধতি। বে-হিসাবীর রাষ্ট্র-তরণী যে কোনো মুহূর্ত্তে মাঝ-দরিয়ায় বানচাল হইয়া যাইতে পারে। তাই সামরিক খরচা রাজ্য-পরিচালনায় একটা প্রধান ব্যাপার হইলেও কোনো রাষ্ট্রই দেউলিয়া হইয়া সৈন্য-বিভাগে ব্যয় করে না। পৃথিবীর কয়েকটি প্রধান দেশের রাজস্বের অনুপাতে তাহাদের সামরিক ব্যয়ের হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল। ভারতের উপরে যে কি বিরাট জুলুম চলিয়াছে এই তালিকাটির দিকে লক্ষ্য করিলে তাহারও পরিচয় পাওয়া যায়।

দেশ			রাজ্য-রক্ষার ব্যয় রাজস্বের অনুপাতে		
ভারতবর্ষ	...	...	শতকরা	৬৩'৮	ভাগ
ইংলণ্ড	...	...	,,	৫৩'৭	,,
অষ্ট্রেলিয়া	...	...	,,	৪৮'৩	,,
কেনেডা	...	...	,,	২৪'২	,,
দক্ষিণ আফ্রিকা	...	...	,,	৫'২	,,
স্পেন	...	...	,,	১৭'৬	,,
ফ্রান্স	...	...	,,	২০	,,
ইতালী	...	...	,,	১৭'৩	,,
ইউনাইটেড ষ্টেট্স	...	...	,,	৩৮'২	,,
জাপান	...	...	,,	৪৯	,,

ইউনাইটেড ষ্টেট্স তাহার আয়ের ৩৮ ভাগ মাত্র সামরিক বিভাগে ব্যয় করে, ফ্রান্স করে কেবল মাত্র ২০ ভাগ। ইতালী দুনিয়াকে হুমকি দিয়া চলিতে সুরু করিয়াছে—তবু তাহার সামরিক বিভাগের খরচা রাজস্বের ২৭ ভাগ মাত্র। কেবল ইংলণ্ড এবং জাপানের ব্যয় এ দিক দিয়া যথেষ্ট বেশী। তাহার কারণও আছে। তাহারা গোটা দুনিয়াকে কুক্ষিগত করিবার স্বপ্নে মশ্‌গুল হইয়া আছে। সাম্রাজ্যের লোভে তাহারা দিশা-হারা। সুতরাং তাহাদের সামরিক খরচ যে আর সকলকে ছাপাইয়া উঠিবে তাহাতে বিস্ময়ের কোনো কারণ নাই। কিন্তু তবু রাজস্বের অনুপাতে সামরিক ব্যবস্থার জন্য তাহারা যাহা ব্যয় করে, পরাধীন ভারত, যাহার ঘাড়ে হীনতার জোয়াল চাপিয়া বসিয়াই আছে তাহার ব্যয়ের অনুপাতে তাহা ঢের কম

যে দেশ স্বাধীন সামরিক খরচার প্রয়োজন তাহারই। কিন্তু যে দেশ পরাধীন তাহার রাজস্বের শতকরা ৬৩ টাকা সৈন্য বিভাগের দায় মিটাইতে ব্যয় হয়—এ ব্যাপারটা যেমন অদ্ভুত তেমনি হাস্যকর। কিন্তু এই নিষ্ঠুর প্রহসনই বৎসরের পর বৎসর নূতন করিয়া ভারতবর্ষে অভিনীত হইতেছে।

ভারতবর্ষ অত্যন্ত দরিদ্র দেশ। সৈন্য-বিভাগের ভিতর দিয়া ভারতবর্ষে যে শোষণ চলিয়াছে তাহা অপরিমিত। এরূপ ব্যয়ভার সমৃদ্ধ দেশের পক্ষে বহন করাও কঠিন—ভারতের তো কথাই নাই। সুতরাং গান্ধীজী যে ইংলণ্ডের সঙ্গে বোঝাপড়ায় সৈন্য-বিভাগের অধিকার থাকা কথাটার উপর অতখানি জোর দিয়াছেন তাহার অর্থও সুস্পষ্ট। বিভিন্ন দেশের সামরিক ব্যয়ের তালিকায় ভারতের নাম সপ্তম স্থান অধিকার করিয়া আছে।

কিন্তু প্রতিষ্ঠা বা শক্তির পরিচয় লইয়া যদি তালিকা রচিত হয় তবে সে তালিকার কোথাও তো ভারতের নামের হদিস খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। নিরস্ত্রীকরণ ব্যবস্থার মূল সূত্র দুইটি—(১) দুর্ব্বল জাতি সমূহকে রক্ষা করা। (২) কোনো জাতিরই যুদ্ধের উপকরণ এরূপ ভাবে বর্দ্ধিত হইতে না দেওয়া যাহাতে সে জাতি জগতের ভয়ের কারণ হইয়া দাঁড়াইতে পারে। উপরোক্ত তালিকাটি এই উদ্দেশ্যকেই অট্টহাসি দ্বারা আশ্চর্য্য রকমে ভ্যাঙ্চাইয়া চলিয়াছে।

কমিটি ও কমিশন

ভারতীয় ধনিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ

সংবাদপত্রের ফাইল ঘাটিতেছিলাম। হুইটলে কমিশন সম্পর্কে কতকগুলি মন্তব্য চোখে পড়িল। তখনও কমিশন বসে নাই—কেবল বসিবার তোড়-জোড় চলিতেছে। তবু তাহাই লইয়া ইংরেজদের ভিতর চাঞ্চল্যের অন্ত ছিল না। সংবাদপত্র হইতেই দুই একটি অংশ উদ্ধৃত করিয়া এই চাঞ্চল্যের পরিচয় দিতেছি। এ চাঞ্চল্য কেবল যে, এই একটি মাত্র কমিশন সম্পর্কেই ইংরেজের মনস্তত্বকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছে—তাহা নহে, ইহার ভিতর দিয়া ভারতের সম্পর্কে তাহাদের অন্তরের গোপন কথাটাও ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাই এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় তো অন্যায় হইবে না।

হুইটলে কমিশন বসিবার আয়োজন সুরু হইতে-না-হইতেই 'ফ্রি প্রেসের' লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা এ সম্বন্ধে বিলাতের জন-নায়কদের মনোভাবের যে পরিচয় পাঠাইয়াছিলেন তাহা এইরূপ :—

"Reference to the Whitley Commission by Labour leader as well as by the Labour press shows that there is in existence a wide spread belief that Indian capitalsts exploit workers under cover of nationalism and that the Labour Government has got to see that the worker is not so exploited. The explanation of

the Indian point of view that what India needs urgently is a strong national economic policy does not strike a sympathetic chord." অর্থাৎ হুইটলে কমিশন সম্পর্কে শ্রমিক নেতাদের মধ্যে এবং শ্রমিক সংবাদপত্র সমূহে যে সব আলোচনা হইতেছে তাহাতে দেখা যায়, তাঁহাদের ভিতর একটা বড় অংশেরই ধারণা যে, ভারতীয় ধনিকেরা জাতীয়তার আবরণে শ্রমিকদিগকে শোষণ করিতেছে এবং সেই শোষণ যাহাতে না চলে শ্রমিক গবর্ণমেণ্টকে তাহারই ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভারতবর্ষের দিক হইতে অবিলম্বে জাতীয় অর্থ নৈতিক নীতি প্রবর্ত্তনের যে প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে তাহাও ইঁহাদের সহানুভূতির তারে ঘা দিতে পারে নাই।

বিশ্লেষণ করিলে ইহার ব্যক্ত ও অব্যক্ত ইঙ্গিত হইতে এই কথাগুলিই ধরা পড়ে :—শ্রমিক নেতা এবং সংবাদপত্রগুলির মতে ভারতীয় কল-কারখানাগুলিতে শ্রমিকদের স্বার্থ যে ভাবে ব্যর্থ হইতেছে, বিদেশী পরিচালিত মিলে সেরূপ হয় না ; জাতীয়তার দোহাই দিয়া যত রকমের অসুবিধায় ফেলা সম্ভব, এ দেশের ধনিক-প্রতিষ্ঠানগুলি শ্রমিকদিগকে সেই সব অসুবিধার দ্বারা উৎপীড়িত করিতেছেন ; সুতরাং এ দেশের পক্ষে বিদেশী কোম্পানীগুলিই ভালো ; নিজেদের অর্থ নৈতিক নীতি পরিচালনের যোগ্যতাও ভারতবর্ষের এখনও জন্মায় নাই ; সে ভার ইংলণ্ডের নিজের হাতেই রাখিতে হইবে।

এ মন্তব্যের ভিতর বিলাতী কোম্পানীর অবশ্য কোনো স্পষ্ট উল্লেখ নাই। কিন্তু জুতার কোথায় কাঁটা উঠিয়াছে, জুতা পায়ে দিলে তাহা ধরিতেও দেরী হয় না। প্রশ্ন উঠিতে পারে—হুইটলে কমিশন সম্পর্কে এ

মন্তব্য প্রকাশ করিবার অর্থ কি ? ইহার অর্থ সম্ভবতঃ গোড়াতেই তাঁহারা কমিশনকে তাঁহাদের উদ্দেশ্যের কথাটা সম্‌ঝাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন—তাঁহারা দেখাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, কোন্ পথ ধরিয়া কমিশনকে কাজ করিতে হইবে।

কিন্তু এ সম্‌ঝানোর কোনোই প্রয়োজন ছিল না। এ ধরণের প্রায় সমস্ত কমিশনই এদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই কাজ করে। না করিলেও, বিলাতের গবর্ণমেণ্টের হাতে সে ক্ষমতা যথেষ্টই আছে যাহার বলে কমিশনের মত নাকচ করিয়া দিয়া নিজেদেরই মত অনুসারে কাজ করা তাঁহাদের পক্ষে অনুমাত্রও কঠিন হয় না। ভারতবর্ষ যে পরাধীন জাত এবং ইংরেজ যে তাহার অভিভাবক—এ কথা তাঁহারাও জানেন, আমরাও জানি।

কিন্তু সে যাহাই হোক্ ভারতীয় ধনিকদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ ইঁহারা উত্থাপন করিয়াছেন তাহার ভিতর কতখানি সত্য আছে তাহাও একবার যাচাই করিয়া দেখা দরকার। কোনো দেশের লোক যদি নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য শ্রমিকদিগকে বিপথে চালাইতে চেষ্টা করে তবে তাহাও অন্যায়। সে চেষ্টাকে সমর্থন করিবার এতটুকু কারণ নাই। শ্রমিকদের সংখ্যা কম বলিয়া, বা নিজেদের দেশের লোকের দ্বারা অন্যায় অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া তাহা অন্যায়ের পংক্তি হইতে বাদ পড়ে না।

এ সম্বন্ধে বিচার করিয়া দেখিতে গেলে প্রথমে দেখা দরকার—যাহাতে শ্রমিক খাটে সেরূপ প্রতিষ্ঠান এ দেশে কতগুলি আছে ও সেই সব প্রতিষ্ঠানের কতটিই বা দেশী আর কতটিই বা বিদেশী এবং তাহাদের কোন্ প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের উপর কিরূপ ব্যবহার অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

ধরিতে গেলে—রেলওয়ে, কয়লার খনি, জুট-মিল, কাপড়ের কারখানা এবং চা বাগান—এই পাঁচটি ব্যবসাতেই এ দেশের শ্রমিকদের কর্ম্মক্ষেত্র বিশেষ ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। কারণ যে ১৫।২০ লক্ষ লোক এ দেশের কল-কারখানায় কাজ করে তাহার ভিতর—রেলওয়েতে খাটে ১ লক্ষ ১২ হাজার লোক; কয়লার খনিতে খাটে ১ লক্ষ ৮১ হাজার; পাটের কলে খাটে ২ লক্ষ ৮৭ হাজার; কাপড়ের কলে খাটে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার এবং চা বাগানে খাটে ৪ লক্ষ ৪৭ হাজার লোক।

ইহাদের মধ্যে রেলওয়ে বিভাগটি সম্পূর্ণ ভাবেই বিদেশীদের দ্বারা পরিচালিত। এই রেলওয়ের স্বরূপ স্বর্গীয় লালা লজপত রায়ের একটি কথাতেই চমৎকার ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন:—

"Indian Railways were built and worked by British companies who ran no risk but who fleeced the Indian tax-payers." অর্থাৎ ব্রিটিশ কোম্পানীগুলিই ভারতীয় রেলওয়ে তৈরী করিয়াছিল এবং তাহার কাজও নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে তাহাদের দ্বারাই। এজন্য কোনো ঝক্কিই তাহাদিগকে সহ্য করিতে হয় নাই। অথচ ভারতীয় ট্যাক্সদাতাদের নিকট হইতে তাহারা কোটি কোটি টাকা শোষণ করিয়া লইয়াছে। রেলওয়ে কোম্পানীগুলির অনুগ্রহে ভারতীয় ট্যাক্সদাতাদের অবস্থা তো এইরূপ, শ্রমিকদের অবস্থাও যে সুবিধাজনক নহে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় রেলওয়ে ধর্ম্মঘটের দ্বারা—রেলওয়ে কনফারেন্সে রেলওয়ে কর্ম্মচারীরা যে আবেদন-নিবেদন ও দুঃখের ফিরিস্তি খুলিয়া বসে তাহার দ্বারা।

অন্য কয়েকটির ব্যবসার অবস্থাও ইহা অপেক্ষা ভালো নহে। ১৯২৭—২৮ সালের Investor's India Year-Book-এর কয়লার খনি, পাটের কল, কাপড়ের কল, চা বাগান প্রভৃতি ব্যবসার উল্লেখযোগ্য লিমিটেড্ কোম্পানী অর্থাৎ যৌথ-কারবারগুলির হিসাব-নিকাশ প্রদত্ত হইয়াছে। একমাত্র কাপড়ের কল ছাড়া অন্য তিনটি ব্যবসাতে দেশী লোকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত কোনো প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ নাই বলিলেও বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ৮২টি কয়লার খনির উল্লেখ আছে—তাহার ৮১টিই বিদেশী তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। ৫০টি পাটের কলের উল্লেখ আছে, তাহার ভিতর ৩টি মাত্র দেশী লোকের কর্তৃত্বে পরিচালিত হয়, বাদ-বাকী ৪৭টিই চলে বিদেশীদের তত্ত্বাবধানে। ২২৯টি চা কোম্পানীর উল্লেখ আছে তাহার ভিতর একটিও দেশী প্রতিষ্ঠান নহে। কেবলমাত্র কাপড়ের কলের ব্যাপারে এই নিয়মের বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। Investor's Year-Book যে ৬৯টি কাপড়ের কলের উল্লেখ করিয়াছে তাহার ৩৯টি দেশী এবং ৩০টি বিদেশী কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হয়।

Year-Book-এর এই অঙ্কগুলি অবশ্য সম্পূর্ণ নহে। এ গুলি ছাড়া উপরোক্ত ব্যবসাগুলি সম্পর্কে এ দেশে আরও অনেক কল-কারখানা আছে। কিন্তু তাহা হইলেও এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে,—উল্লেখযোগ্য মিলের নাম এ তালিকা হইতে বাদ পড়ে নাই। শ্রমিক বলিতে আজ যাহাদিগকে আমরা বুঝি তাহাদের কর্ম্মক্ষেত্র বলিতেও প্রধানতঃ এই সব লিমিটেড্ কোম্পানীর কারখানা বা মিলকেই বুঝায়। কারণ শ্রমিকেরা সঙ্ঘ-বদ্ধভাবে কাজ করিবার সুবিধা সাধারণতঃ এই গুলিতেই লাভ করে। সুতরাং এই সব কল-কারখানার ক্ষেত্রেও বিদেশীরাই ভারতের মসনদ গুলজার

করিয়া বসিয়া আছেন। এই সব বিদেশী-পরিচালিত মিলের এক-একটি বৎসরে কোটি কোটি টাকা লাভও করে। ইহাদের বাহ্যাড়ম্বরেরও সীমা নাই। ইহাদের তুলনায় দেশী কোম্পানীগুলি কোনো রকমে টিম্ টিম্ করিয়া টিকিয়া আছে মাত্র।

বস্তুতঃ রেলওয়ে কোম্পানীগুলির মতোই ভারতের শোষণ ইহাদের দ্বারাও অতি নিপুণভাবেই নিষ্পন্ন হইতেছে এবং যে শ্রমিকদের দুঃখে বিলাতের লেবর গবর্ণমেণ্ট এবং সংবাদপত্রগুলি অতিমাত্রায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন তাহাদের শোষণও ইহাদের দ্বারা নিতান্ত সামান্য হইতেছে না। এইজন্য বিদেশীদের কল-কারখানাতেই আজ এ দেশের শ্রমিকেরা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অসন্তুষ্ট। ধর্ম্মঘট, হানাহানি প্রভৃতির অভিনয় ইঁহাদের মিলেই মাত্রা ছাড়াইয়া উঠে।

এরূপ ক্ষেত্রে শ্রমিকদের সম্পর্কে দেশী প্রতিষ্ঠানের অপেক্ষা বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলির বিধি-ব্যবস্থা যে ভালো তাহা মনে করিবারও কোনো কারণ নাই। বিদেশী-পরিচালিত মিলেও সাধারণ শ্রমিকেরা ১৫।২০ টাকায় বেশী মাহিয়ানা পায় না; তাহারা বাস করে একই রকমের বস্তিতে—যাহার বীভৎস আবহাওয়া দেহ ও মন উভয়ের পক্ষেই মারাত্মক; খায় তাহারা একই রকমের জিনিষ; পরে একই রকমের বস্ত্র; জীর্ণ হইয়া উঠে তাহারা একই রকমের পরিশ্রমে এবং মরেও একই রকমের মৃত্যুতে। ইহা সত্ত্বেও যখন বলা হয়, "Indian capitalists exploit workers under cover of nationalism and that the Labour government has got to see that the worker is not so exploited" তখন তাহার অর্থ

ইহাই দাঁড়ায় যে, লেবার গবর্ণমেণ্টের হাতে শক্তি আসিয়াছে। সেই শক্তির জোরে যেন তাঁহারা এমন পথ অবলম্বন করেন যাহাতে ভারতীয় শ্রম-শিল্পের কণ্ঠনালী রোধ করিয়া বিদেশী অর্থাৎ বিলাতী কোম্পানীগুলিরই প্রসারের পথ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হয়।

ডেলি হেরল্ডের অভিমত

কিন্তু এতো গেল স্বদেশী প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে অভিযোগ। এ দেশের রাজনৈতিকদের উপরেও আর এক রকমের অভিযোগ আরোপ করা হইতেছে এবং অর্থের গূঢ়তায় এ অভিযোগের গুরুত্বও কম নহে। এই হুইটলে কমিশন সম্পর্কেও এ অভিযোগ আনিয়াছেন বিলাতের 'ডেলি হেরল্ড' পত্রিকা। 'ফ্রী-প্রেসের' সংবাদদাতার কথায় তাঁহাদের মন্তব্যটি এইরূপ—

"ভারতে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনই প্রবর্ত্তিত হউক, আর সীমাবদ্ধভাবে স্বায়ত্তশাসনই প্রবর্ত্তিত হউক, ধনীদের কর্ত্তৃক শ্রমিকদের শোষণ কার্য্য সমভাবেই চলিবে। সুতরাং শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির জন্য সকল অবস্থাতেই চেষ্টা করিতে হইবে। এই চেষ্টা জাতীয় আন্দোলনের বিরোধী হইতে পারে। তবে সকল দেশেই জাতীয়তার দোহাই দিয়া অনেক অন্যায় কার্য্য চলিয়া থাকে, কমিশনকে এজন্য ইতস্ততঃ করিলে চলিবে না।"

এ ইঙ্গিতের ভিতরের অর্থও সুস্পষ্ট। ভারতবর্ষের মিলগুলিতে ধর্ম্মঘটের মাত্রা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে। এ ধর্ম্মঘটগুলিকে রাজনৈতিক ব্যাপার বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারিলে ইহাদিগকে দমন করিবার পক্ষে সুবিধা তো হয়ই, তাহাতে জাতীয় আন্দোলনের উপর একটা চাপ দেওয়ার সুযোগও মিলিতে

পারে। কিন্তু সত্যসত্যই যাহারা এ দেশের শ্রমিকদের অবস্থা জানেন, তাহাদের দুঃখ, তাহাদের নির্য্যাতন, তাহাদের অভাব-অভিযোগের সহিত যাঁহারা পরিচিত তাঁহারা এ কথাও জানেন যে, এগুলি রাজনৈতিক কারসাজি তো নহেই, রাজনীতির সহিত ইহাদের বিশেষ কোনো সম্বন্ধও নাই। শ্রমিকদের প্রতি যে সব অন্যায় অনুষ্ঠিত হয় ইহা তাহারই প্রতিক্রিয়া মাত্র। তাহাদের নিজেদের ভিতরে যে অসন্তোষ জাগিয়া উঠিয়াছে এগুলি তাহারই অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নহে; এবং ইহার ভিতরে রাজনৈতিক অসন্তোষের অবতারণা করা এই বিদেশী কৌটিল্যদেরই কূট-নীতির আর একটা মস্ত বড় চাল মাত্র।

বস্তুতঃ যাঁহারা কোনো বিষয়ে খোসা লইয়াই কেবল সন্তুষ্ট থাকেন না, তাহার ভিতরের শাঁসেরও সন্ধান লইবার জন্য চেষ্টা করেন, তাঁহারা 'হুইলটলে-কমিশনের' সম্পর্কে এই সব মন্তব্যের অর্থ ইহা ছাড়া আর কিছু মনেও করিতে পারেন না। সত্য সত্যই শ্রমিকদের শোষণের আশঙ্কাই যদি ইঁহাদের দরদের স্থানটাতে ঘা দিত তবে ইহা অপেক্ষাও ঢের বড় শোষণের ক্ষেত্র আছে যাহা উপেক্ষা করা ইঁহাদের পক্ষে কোন ক্রমেই সম্ভবপর হইত না। কারণ সে শোষণ শ্রমিকদের শোষণের অপেক্ষাও ঢের বেশী অন্যায় ভাবে অনুষ্ঠিত হয়, এবং তাহাদের অপেক্ষাও বহু লক্ষ গুণ বেশী মানুষকে এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদিগকেও পিষ্ট ও বিধ্বস্ত করে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—ভারতবর্ষে শ্রমিকদের সংখ্যা মোটের উপর ১৫।২০ লক্ষ মাত্র। কিন্তু ভারতবর্ষের জন-সংখ্যা ৩০ কোটি। ১৫ লক্ষ লোকের কষ্টের কথা মনে করিয়া যাঁহাদের বুকে দুঃখের উচ্ছ্বাস ফেনায়িত হইয়া উঠে, ৩০ কোটি লোকের দুঃসহ দুঃখে তাঁহাদের হৃদয় অত্যুগ্র ব্যথায়

কাটিয়া পড়াই স্বাভাবিক। তাহা না হইয়া সেজন্য যদি তাঁহাদের নিশ্বাসটিও না পড়ে তবে উচ্ছ্বাসটা যত বড়ই হোক্ না কেন, তাহা যে বস্তুশূন্য ফেন-বুদ্বুদ এ সন্দেহ স্বভাবতঃই হয়—তাহাকে আদি ও অকৃত্রিম বলিয়া মনে করা নানা কারণেই অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। বস্তুতঃ শ্রমিকদের যে দুঃখ যাহা লইয়া ইঁহারা এত হা-হুতাশ করিতেছেন—সে দুঃখও এই বৃহত্তর শোষণের ফলেই এত নিদারুণ হইয়া উঠিয়াছে। ভারতকে যদি এরূপ ভাবে দোহন না করা হইত তবে শ্রমিকদিগকে বণিকদের জাতাকলে এমন ভাবে পিষ্ট হইতে হইত কি না তাহাতেও সন্দেহ আছে। গৃহ-শিল্পের আশ্রয়ে তাহারা হয়তো ঢের সহজে মোটা ভাত মোটা কাপড়ের সংস্থান করিয়া লইতে পারিত।

মিঃ কে-টি-শ নানা রকমের হিসাব-নিকাশের ফিরিস্তি ঘাঁটিয়া বৎসরে ভারতবর্ষের কত টাকা যে বাহিরে চলিয়া তাহার একটি ফর্দ্দ তৈরী করিয়াছিলেন। ফর্দ্দটি নিম্নে প্রদত্ত হইল—

রাজনৈতিক খরচা বা হোম চার্জ্জ …	৫০	কোটি টাকা
ভারতের রেজেষ্ট্রীকৃত বিদেশী মূলধনের সুদ	৬০	,, ,,
মালের ভাড়া ও যাত্রীদের ভাড়া বাবদ বিদেশী কোম্পানীর প্রাপ্য …	৪১·৬৩	,, ,,
ব্যাঙ্কিং কমিশন … …	১৫	,, ,,
ভারতের পরিচালিত বিদেশী কারবার ও ব্যবসায়ীদের লাভ প্রভৃতি ..	৫৩·২৫	,, ,,
	২১৯·৮৮	,, ,,

অর্থাৎ প্রায় ২২০ কোটি টাকা

এই যে শোষণ—এ শোষণ কাহারও চোখ এড়াইয়া যাইতে পারে না। ভারতের কোনো শোষণ সম্বন্ধে, কোনো অন্যায় সম্বন্ধে যাঁহার মন এতটুকু সজাগ, ইহা তাঁহার কাছে ধরা পড়িবেই। এই শোষণের প্রতিকারের কথা না বলিয়া এ দেশের বণিক সম্প্রদায়ের অত্যাচারের কথা লইয়া এবং সেই অত্যাচারের তালিকা হইতে বিদেশী বণিক সম্প্রদায়গুলিকে বাদ দিয়া যাঁহারা বাগাড়ম্বর করেন, তাঁহাদের দরদের উপর সন্দেহ স্বতঃই হয়। তাহার ভিতরে তো আন্তরিকতা খুঁজিয়া পাওয়া যায়ই না, বরং তাহার ভিতর দিয়া যে নূতন শোষণের ইঙ্গিত উঁকি মারে তাহাতেই দেশের লোকের মন শঙ্কিত ও ভীত হইয়া পড়ে।

হুইটলে কমিশন ও ষ্টেট্‌স্‌ম্যান

হুইটলে কমিশন সম্পর্কে বিলাতী কাগজগুলি আলোচনার উদ্দেশ্যের মোটামুটি একটা আভাস উপরোক্ত মন্তব্যগুলি হইতেই পাওয়া যায়। কিন্তু এদেশেও ইহা লইয়া যে সাড়া পড়িয়াছিল তাহাও সামান্য নহে। এ দেশের বিলাতি কাগজগুলিতেও বেশ একটা ঝাঁঝালো সুরের আমেজ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু এ সম্পর্কে 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান' যে স্বীকারোক্তি করিয়াছিলেন তাহা একেবারে চরম। উক্তিটি এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। ভারতের এই দরদী বন্ধুটি লিখিয়াছিলেন—"Britain is an industrial Country. It wants a market for its manufactured goods. It wants beyond that vast supplies of food and raw materials that it could draw from India in exchange for its own products. All its commercial

interests point to the advantage of keeping India as an agricultural country or at best with its industries in a primiative condition." (Statesman, May 29, 1929.)

অর্থাৎ ব্রিটেন বাণিজ্য-প্রধান দেশ। তাহার পণ্যের জন্য বাজার আবশ্যক। তাহা ছাড়া খাদ্য দ্রব্য এবং কাঁচামালও তাহার পক্ষে প্রচুর পরিমাণে আবশ্যক। ইংলণ্ডের পণ্যের বিনিময়ে এ গুলি ভারতবর্ষ হইতে সংগ্রহ করা হয়। বাণিজ্য সংক্রান্ত স্বার্থের দিক দিয়া এ জন্য ভারতবর্ষকে কৃষি-প্রধান দেশ করিয়া রাখাই দরকার। বড় জোর আদিম যুগের ব্যবসা-বাণিজ্যের কোঠায় তাহাকে পদার্পণ করিতে দেওয়া যাইতে পারে।

অবশ্য 'ষ্টেট্স্‌ম্যান'-এর এত বড় একটা স্বীকারোক্তির উদ্দেশ্য ছিল অন্যরূপ। এ কথা বলিয়া তিনি ইহাই প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষকে কল-কারখানার প্রসারে সাহায্য না করাই ইংলণ্ডের স্বার্থের অনুকূল। তথাপি সে এমনি উদার ও নিঃস্বার্থপর যে ভারতীয় শ্রমিক সমস্যা সমাধানের জন্য নিজের ক্ষতি করিয়াও কমিশন পাঠাইতে দ্বিধা করিতেছে না। অতঃপর এত বড় উদারতা ধরিতে না পারিবার জন্য এই চিরন্তন ভারত-বন্ধুটি আমাদিগকে ব্যঙ্গ করিয়াছেন, আমাদের ভিতর কৃতজ্ঞতার অভাব দেখিয়াছেন। অবশেষে আমাদিগকে উপদেশ দিতেও দ্বিধা করেন নাই। বুদ্ধিমান লোক যখন পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া খাইতে চায় তখন তাঁহার জন্যও তাহার যুক্তির অভাব হয় না।

কমিশন-কমিটির মূল্য

ভারতবর্ষের শোষণ চলে কতক শাসন-ব্যবস্থার মারফৎ, কতক চলে বিদেশী বণিকদের মারফৎ। অবশ্য যদিও এ উভয়ের ভিতর সীমা-রেখা

টানিতে পারা যায় না। কারণ এ দেশের শাসন-ব্যাপারে বিলাতী বণিকদের হাত খুব সামান্য নহে। আমলাতান্ত্রিক শাসন প্রণালীর বিরুদ্ধে জাতির প্রতিবাদ আজ আর অনুমাত্রও অস্পষ্ট নহে, বিদেশী বণিকদের শোষণের বিরুদ্ধেও তাহার মতবাদ আজ সুস্পষ্ট। এই জন্যই আজ দেশের সাইমন কমিশন বসে, হুইটলে কমিশন বসিবার আয়োজন হয়। কিন্তু এ সব আয়োজন যে অতি মাত্রায় অনর্থক—এ কথা বলিলেও আজ আর অত্যুক্তি করা হয় না। কারণ সুপারিশের নিক্তিটি যদি এ ধারে একটু মাত্র হেলিয়া পড়ে তবে তাহার যে কোনো মূল্যই নাই তাহার পরিচয় আমরা বহুবারই পাইয়াছি। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ইঞ্চকেপ কমিটি বসিয়াছিল। তাঁহারা ফন্দ করিয়া ভারত-সরকারের ব্যয় হইতে সারে ১৯ কোটি টাকা ছাঁটিয়া ফেলিবার একটা পথও দেখাইয়া দিয়াছিলেন। শোষণ-নিঃস্ব এই ভারতের দারিদ্র্যে যে ইংরেজের চক্ষু সজল হইয়া উঠিয়া ইঞ্চকেপ কমিটির সৃষ্টি করিয়াছিল, ব্যয় সংক্ষেপের ফিরিস্তি দেখিয়া তাহারাই ইঞ্চকেপ সাহেবের শ্রমকে ধামাচাপা দিয়াই সার্থক করিয়া তুলিয়াছেন। ১৯২৭ সালে বসিয়াছিল স্কীন কমিটি। এই কমিটিতে সরকারের মনোনীত সদস্যেরাই ভারতীয় সৈন্য বিভাগে ভারতবাসীকেই গ্রহণ করিবার একটি মন্থর পথ নির্দ্দেশ করেন। নিজেদের স্বার্থের প্রতিকূল বলিয়া সে নির্দ্দেশও বাজে কাগজের ঝুড়িতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। এমনি আরও বহু কমিটির উদাহরণ দেখানো যায়।

সুতরাং কোন্ কমিটি বা কোন্ কমিশন কবে বসিবে এবং তাহার সিদ্ধান্ত কি হইবে সে সম্বন্ধে আমাদের কোনো আশাও নাই, উৎকণ্ঠাও নাই। তবে এই চিনির আস্তর দেওয়া বস্তুগুলির ভিতরে কি আছে তাহা

দেশবাসীর জানা দরকার এবং সেই জন্যই এত কথা বলার আবশ্যক হইয়াছে। একটা জাতি যখন পরাধীন হয় তখন তাহাদিগকে কতকটা বা আত্ম-বিস্মৃত করিয়া রাখার জন্য এবং কতকটা বা স্তোক দেওয়ার জন্যও এই সব কমিটি-কমিশন বসে। পরাধীনতা স্থায়ী করিয়া রাখার উহা একটা সাধারণ কৌশল মাত্র। এ ভাবে সত্যকার অধিকার কদাচিৎ কিছু লাভ করা যায়। এই জন্যই তাহা আশাতীত ব্যাপার—আর যাহা আশাতীত ব্যাপার তাহার উপর ভরসা না রাখাই ভালো। বস্তুতঃ মুক্তির রসদ সংগ্রহীত হয় নিজেদের ভিতর হইতে। জাতির জানিয়া রাখা দরকার, যে ভিক্ষুক কখনো সে পরম ধনের সন্ধান লাভ করিতে পারে না।

ব্যাধি ও প্রতিকার

কোনো জাতিকে পরাধীন করিয়া দীর্ঘদিন পায়ের তলায় চাপিয়া রাখা যায় না, যদি শিক্ষা, দীক্ষা, সভ্যতার দিক দিয়াও তাহার পরাজয়টা সম্পূর্ণ করিয়া তোলা না যায়। এই জন্যই ইংরেজ ভারতবর্ষকে কেবলমাত্র জয় করিয়াই নিশ্চিন্ত হইতে পারে নাই, বৈদগ্ধ্যের (Culture) দিক দিয়াও তাঁহার জয়কে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। দেড়শত বৎসর ইংরেজ-শাসনের ভিতর ইউরোপীয় সভ্যতার মোহে আমরা এতই মশ্‌গুল হইয়া পড়িয়াছি যে, আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য যে কোন্ ফাঁকে নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহার খোঁজ রাখাও আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। ভারতবর্ষের সহজ সরল জীবন-যাত্রার প্রতি আর আমাদের শ্রদ্ধা নাই—একথা আজ যেমন সুস্পষ্ট, ইউরোপের সংঘাতময় জীবনের উপরেই আমাদের আকর্ষণ বাড়িয়া গিয়াছে তাহার চিহ্নও আবার তেমনি সুস্পষ্ট।

বৈদেশিক সভ্যতার কাছে ভারতীয় সভ্যতার এই যে অন্যায় এবং অসঙ্গত পরাজয়—ইহা যে কেবলমাত্র সহরেই নিবদ্ধ আছে তাহাও নহে। ধীরে ধীরে তাহা পল্লীর দূরতম প্রান্তেও ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ভদ্রলোকদের দেখাদেখি দেশের চাষা-ভূষা জন-সাধারণও আজ বৈদেশিক ভাবেরই ভাবুক। বেশ বোঝা যায়, তাহারাও এখন আর অনাড়ম্বর জীবন যাত্রায় সন্তুষ্ট নহে, গৃহশিল্পের অল্প অথচ নিশ্চিত উপার্জ্জনেও এখন আর তাহাদের মন উঠে না। তাহারাও মাতিয়া উঠিয়াছে ইউরোপের অনুকরণে যে

সব অস্বাস্থ্যকর কল-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাতেই জীবনের স্বাধীন বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া দাসখৎ লিখিয়া দিবার জন্য।

ইহার ফলে এ দেশে গ্রামও নষ্ট হইয়াছে, সহরও সন্তোষ ও আনন্দ দিতে পারিতেছে না। গ্রামের দিকে তাকাইলেই দেখা যায়, যেখানে চক-মিলানো ইমারত, দেবালয় প্রভৃতি ছিল সেখানে ভগ্নস্তূপের উপর বন-জঙ্গল গজাইয়া উঠিয়াছে, যেখানে প্রকাণ্ড দীঘি-পুষ্করিণী প্রভৃতি ছিল সেখানে দেখা দিয়াছে হাজা-মজা, পানায় ভরা কতকগুলি পঙ্ক-কুণ্ড। যে স্থান শত শত সুস্থ আনন্দিত লোকের কল-কোলাহলে মুখরিত ছিল আজ সে সব স্থানে ব্যাধি-পীড়িত ক্ষীণ দুর্ব্বল কণ্ঠের আর্ত্তনাদ ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না।

সহরের অবস্থাও ইহা অপেক্ষা ভালো নহে। সহরের এক দিকের হাস্যোজ্জ্বল চেহারা দেখিয়া মনে হয় বটে দুঃখ নাই; কিন্তু আর এক দিকের চেহারা যাহাদের চোখে পড়িয়াছে তাহাদের পক্ষে অশ্রু সম্বরণ করাও অসম্ভব হইয়া পড়ে। কারণ সহরের আর এক দিকে জাগিয়া আছে লক্ষ লক্ষ লোকের অনশন ও অর্দ্ধাশনের হাহাকার, অন্যায় ও অসংযমের নির্ম্মম নিষ্পেষণ।

ভারতবর্ষের আদর্শের কোনো ছাপ মনের কোনোখানে লাগিয়া থাকিলে কোটি কোটি লোকের এই অপরিসীম দুঃখ দেখিয়া আমাদের পক্ষে নির্লিপ্ত ভাবে চুপ করিয়া থাকা আজ কখনো সম্ভবপর হইত না। কিন্তু মানবতার এই লজ্জাকর অপমান ও গ্লানি চোখের উপর প্রত্যক্ষ করিয়াও আজ আমরা বেশ আছি। আমাদের ব্যক্তিগত সুখ-বিলাস, আমোদ-আহ্লাদের ইহাতে কোনই ব্যতিক্রম ঘটিতেছে না। ইহা হইতেও প্রমাণ হয় যে,

আমরা আমাদের সভ্যতার মর্ম্ম-কথাটাই ভুলিয়া গিয়াছি, আমাদিগের মন ইউরোপের স্বার্থপর সম্ভোগ-সর্ব্বস্ব সভ্যতার পায়েই মাথা বিকাইয়া দিয়াছে।

সাধারণের বিশ্বাস—পলাশীর যুদ্ধে বাংলাকে হারাইয়া এবং আরও কয়েকটি খণ্ড যুদ্ধে ভারতের বিভিন্ন শক্তিকে পরাজিত করিয়া ইংরেজ ভারতবর্ষে তাহার অধিকারের বনিয়াদ পাকা করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এ কথা সত্য কথা নহে। যুদ্ধ জয়ের দ্বারা ইংরেজেরা ভারতের মাটিকে করায়ত্ত করিয়াছিল সত্য, কিন্তু মাটিকে করায়ত্ত করিয়া কোনো দেশে অধিকারের বনিয়াদ পাকা করা যায় না। কারণ দেশের মানুষের মনে অসন্তোষ থাকিলে সুযোগ পাইলেই এই অধিকারের দাবী তাহারা উল্টাইয়া ফেলিয়া দেয়। সেই জন্যই অধিকারের বনিয়াদ যাহারা পাকা করিতে চায়, তাহারা দেশ জয় করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, দেশের সভ্যতাকেও নিজেদের সভ্যতার দ্বারা অভিভূত করিতে চেষ্টা করে। ইংরেজেরাও তাহাই করিয়াছে। তাহাদের সভ্যতার দ্বারা আমাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্যটাকে ধ্বংস করিয়াই এ দেশে তাহাদের অধিকারের বনিয়াদ তাহারা পাকা করিয়া তুলিয়াছে।

এ অবস্থা রাজনৈতিক পরাধীনতার অবস্থা হইতেও শোচনীয়। কারণ রাজনৈতিক পরাধীনতা কেবল দেহটাকেই বন্দী করে। কিন্তু এই যে সভ্যতার জয় যাহা একটা জাতির বৈদগ্ধ্যকেও নষ্ট করিয়া ফেলে, তাহা মানুষের মনকেও দাসত্বের নিগড়ে বাঁধিয়া ফেলে। পরাধীনতা সব রকমেরই খারাপ। কিন্তু তবু মন স্বাধীন থাকিয়া দেহটা পরাধীন হইলেও মুক্তি লাভের পথ অপেক্ষাকৃত সহজ থাকে। অন্ততঃ তাহাতে স্বাধীনতার

সুযোগ মনকে চোখ ঠারিয়া পার হইয়া যাইতে পারে না। কিন্তু মন যখন জেতার সভ্যতার কাছে আপনাকে বিকাইয়া দেয় মানুষের পরাজয় তখনই সম্পূর্ণ হয়, তাহার দুর্ভাগ্যও তখনই চরমে আসিয়া দাঁড়ায়।

এইরূপ পরাজয়ের পরিণাম যে কি, ভারতবর্ষে এই মুহূর্তেও তাহার অজস্র পরিচয় পাওয়া যায়। শিক্ষিত ভারতবাসীর ভিতরেও এমন লোকের অভাব নাই যাঁহারা এখনও মনে করেন—বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দেই তো জীবনের ধারা বহিয়া চলিয়াছে, তবে কেন স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার লাভের জন্য পায়তাড়া করিয়া অনর্থক অশান্তির সৃষ্টি করা? ইংরেজকে ইঁহারা নিজেদের অপেক্ষা জাতি হিসাবে বড় করিয়াই দেখেন এবং বড় করিয়া দেখেন বলিয়াই মনে করেন—তাঁহাদের সমকক্ষ হইতে আমাদের এখনও অনেক দেরী। সুতরাং আমাদের পক্ষে স্বাধীনতার দাবী করাও অন্যায়—শোষণ চলিলেও শাসনের ভার হাতে লওয়ার সময় এখনও আমাদের আসে নাই।

আমাদের আর্থিক দুঃখের যাহা কারণ, আমাদের মানসিক অধঃপতন ও জাতীয় দুরবস্থারও তাহাই কারণ। অন্ততঃ আমাদের আত্মবিস্মৃতি অর্থাৎ শিক্ষা ও সভ্যতার দিক দিয়া ইংরেজের জয় (Cultural Conquest) যে আমাদের সর্ব্বপ্রকার হীনতা ও অধঃপতনেরই মূলে আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই আজ জাগরণ আনিতে হইলে এই কারণটির দিকেই সর্ব্বাগ্রে নজর দিতে হইবে। যে সভ্যতা আমাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য, আমাদের সামাজিক সাম্যের আদর্শ, আমাদের নৈতিক ও ব্যক্তিগত ধর্ম্মের ধারণাকে খর্ব্ব করিয়াছে তাহার দিক হইতেই আমাদের চোখ ফিরাইতে হইবে। ইউরোপের সভ্যতার মরীচিকা যাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে তাঁহারা এখনও অবশ্য সেই দিকেই তাকাইয়া আছেন।

কল-কারখানা, মিলের মোহে তাঁহারা মশ্‌গুল, অভাব কমাইয়া নহে অভাব বাড়াইয়া, বিলাসের বস্তুকে প্রয়োজনের বস্তুতে পরিণত করিয়া তাঁহারা ময়দানবের কারখানা হইতে নূতন নূতন জিনিষ আমদানী করাকেই মানব-বুদ্ধির চরম সার্থকতা বলিয়া মনে করেন। ঐ পথই আমাদের মুক্তির পথ এ কথা মনে করিতেও তাঁহাদের বাধে না। কিন্তু ইহা যে মোহ এবং খুব প্রকাণ্ড রকমের মোহ তাহাতেও কিছুমাত্র ভুল নাই।

এই মোহের হাত হইতেই আজ আমাদিগকে মুক্তি লাভ করিতে হইবে। আজ এ কথা ভালো করিয়াই বোঝা দরকার যে, এই বৈদেশিক সভ্যতার ভিতর দিয়া যে মনোহরণের বাঁশী বাজিতেছে, তাহার পশ্চাতে বন্ধনেরই জাল আছে, মুক্তির আনন্দ নাই এবং এই পরাজয়ের কলঙ্ক যতদিন আমরা দূর করিতে না পারিব ততদিন আমাদের দুঃখও দূর হইবে না, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাও আমাদের মনে সত্য হইয়া উঠিবে না। দেশের সভ্যতাকে, তাহার বৈশিষ্ট্যকে জানিয়াই দেশকে জানা যায়। কারণ তাহাই দেশের প্রাণ। এই বৈশিষ্ট্যকে না জানিয়া, না বুঝিয়া দেশকে চেনাও যায় না, তাহাকে ভালোও বাসা যায় না, এবং যাহাকে ভালোবাসা না যায়, তাহার জন্য প্রাণ দানের শপথ যত জোর গলাতেই আমরা ঘোষণা করি না কেন, কাজের সময় যে তাহার জন্য কিছুই ত্যাগ করা যায় না, তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই।

সভ্যতার অভিশাপ

'টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া'র একটি প্রবন্ধে যে মন্তব্য ব্যক্ত হইয়াছে তাহা এইরূপ :—"One of the greatest problem of the day is how to dispose of the immense superfluity of wheat, which is bursting the granaries of the world and bringing the farmers of all nations to ruin." এই সঙ্গে আরও একটি মন্তব্য জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে—"There is a definite surplus of cotton, which, unless such heroic expenditure as burning one third of the American stock are adopted, will hang over the market for years." অর্থাৎ দুনিয়ার গোলাঘরগুলিতে গমের সম্পদ উপচাইয়া পড়িতে সুরু করিয়াছে এবং তাহার ফলে সব দেশের কৃষকদের অবস্থাই ধ্বংসের পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই গমকে কি ভাবে কাজে লাগানো যায় বর্ত্তমানে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় সমস্যা। তুলার বাজারেও চাহিদার অপেক্ষা তুলার আমদানী ঢের বেশী। আমেরিকার তুলার ভাণ্ডার হইতে অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ তুলা যদি পুড়াইয়া না ফেলা যায়, তবে বহু বৎসর ধরিয়া তুলার বাজারের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া থাকিবে।

বর্ত্তমান সভ্যতার হৃদয় যে কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহার পরিচয় উপরের উদ্ধৃত এই মন্তব্যটিই। কারণ এই মন্তব্য কোনো ব্যক্তি বিশেষের

নহে, এ মন্তব্য সেই যান্ত্রিক সভ্যতার যাহা মানুষের হৃদয়কে গলাইয়া পাথরে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছে—যাহা ভোগের ভিতর দিয়া তাহার ত্যাগের বৃত্তিকে নষ্ট করিয়া দিয়াছে।

বস্তুতঃ মানুষ যে কত বড় অমানুষ হইয়া পড়িয়াছে এই ধরণের মন্তব্য-গুলির ভিতরের ইঙ্গিত বিশ্লেষণ করিলে তাহা সহজেই ধরা পড়ে। চারিদিকে যদি তাকাইয়া দেখা যায়, তবে ইহাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, দৈন্যের হাহাকার এবং ক্ষুধার আর্তনাদে পৃথিবীর বুক আজ তাহার শান্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে, অনশন এবং উপবাসের ভিতর দিয়াই কোটি কোটি লোকের দিন কাটে, প্রাণ রক্ষার উপযোগী দু'মুঠো অন্নের—একটুকরো রুটির সংস্থান করিতে পারে না এরূপ লোকের অন্তই নাই, পল্লীতে, সহরে সর্ব্বত্র চোখের উপরে এই দুঃসহ মৃত্যুর অভিযান চলিয়াছে। ইহার পরেও এ যুগের সর্ব্বপ্রধান সমস্যা যদি ভাণ্ডারে সঞ্চিত শস্যের আতিশয্য হয়, তবে তাহা দ্বারা সভ্যতার স্বরূপই পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

গমের সম্পর্কে যে কথা বলা যায়, তুলার সম্পর্কেও সেই একই কথারই পুনরুক্তি করিতে হয়। দুনিয়ার বারো আনা লোক বস্ত্রের অভাবে নগ্ন এবং অর্দ্ধ-নগ্ন অবস্থায় থাকে—জীর্ণ ন্যাকড়াও জুটাইতেও পারে না। চোখের উপর প্রতিদিনই আমরা এমনি সব মানুষের ছবি প্রত্যক্ষ করিতেছি। এমন উদাহরণের কথাও শোনা যায় যে, একখানি বস্ত্র ঘরে কাজ করিবার সময় পত্নী ব্যবহার করেন, এবং বাহিরে কাজ করিবার সময় স্বামী সেইখানি পরিয়াই বাহির হইয়া যান। বসনের অভাবে তখন পত্নীকে নগ্ন অবস্থায় গৃহের ভিতরে আত্মগোপন করিতে হয়। হিসাব করিলে দেখা যাইবে—বস্ত্রের অভাবে দেহ আবৃত করিতে পারে না বলিয়া শীতে যাহারা

মারা যায় তাহাদের সংখ্যাও একটা ভয়াবহ সংখ্যা। এরূপ অবস্থাতেও তুলার পরিমাণ বেশী হওয়ায় আমাদের মনে দুর্ভাবনা জাগে, এবং তাহাতে যে সমস্যার সৃষ্টি হয় তাহা সমাধানের পথ খুঁজি আমরা বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দেওয়ার ভিতর দিয়া নহে, তুলাকে পোড়াইয়া নষ্ট করিয়া ফেলিবার ব্যবস্থার ভিতর দিয়া।

মানুষের হৃদয়হীনতা আজ এমনি অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! বস্তুতঃ 'যন্ত্র-রাজ-বিভূতির' এই যুগ মানুষকে ভুলাইয়া দিয়াছে—মানবতার ভিত্তি যাহার উপরে গড়িয়া উঠিয়াছে সেই দয়া, প্রেম, সহানুভূতি প্রভৃতি বৃত্তিকেই। মানুষ দেখিতে শিখিয়াছে শুধু তাহার স্বার্থকে, যে স্বার্থ অত্যন্ত হীন পশুও দেখিতে জানে। জগতের সঙ্গে তাহার যে যোগ, সে যোগের মূলে আজ দেখা দিয়াছে কেবল ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের প্রভাব। সুতরাং সেবার ভিতর দিয়া, ত্যাগের ভিতর দিয়া যে যোগের প্রতিষ্ঠা আজ তাহার বন্ধনও শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। এ সভ্যতার ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় অভিশাপ।

বিজ্ঞানের অদ্ভুত আবিষ্কারগুলি দেখিয়া আমরা ভাবি—জগৎ উন্নতির দিকে উল্কার গতিতে আগাইয়া চলিয়াছে; রেল, মোটর, প্রভৃতির প্রসারের দ্বারা মনে করি—কেবল মহকুমা, জেলা নহে, বিশ্বের সঙ্গে আমাদের যোগ-সূত্র গড়িয়া উঠিতেছে। কিন্তু কি সার্থকতা সেই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের যদি তাহা এমন মনোবৃত্তির সৃষ্টি করিতে না পাবে যাহার দ্বারা মানুষ নিজের স্বার্থের গণ্ডী ডিঙ্গাইয়া বৃহত্তর প্রেমের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিতে পারে? কি সার্থকতা সেই বৈজ্ঞানিক সৃষ্টির যদি তাহা প্রত্যহ নূতন নূতন মারণাস্ত্রেরই উদ্ভাবনের দ্বারা বিশ্বকে সন্ত্রস্ত ও সচকিত করিয়া রাখিতে চায়? আর সে যোগ সূত্রের—যান্ত্রিক সুবিধারই বা কি সার্থকতা

যদি তাহা দীনের আর্ত্তির স্থানে ধনীর সম্পদ আনিয়া বিতরণ না করে, যদি তাহা কেবল শোষণের জন্যই ধনীর হাতের যন্ত্র রূপে ব্যবহৃত হইতে থাকে ?

আমি বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনের জ্ঞানের বিকাশের নিন্দা করিতেছি না। কেবল এই কথাই বলিতেছি যে, সভ্যতার চাপ আজ জ্ঞানের বিকাশের পথও পঙ্কিল করিয়া তুলিয়াছে, সে যাহা শিখাইতেছে তাহা জ্ঞান নহে অজ্ঞান। জ্ঞানের ভিতর দিয়া উদ্ভাসিত হইয়া উঠে মুক্তির আলো, সেবার ধর্ম্ম, কল্যাণের ইঙ্গিত। কিন্তু যান্ত্রিক সভ্যতার আওতায় আজ যে জ্ঞান বিকাশ লাভ করিতেছে তাহাতে মুক্তির আলোও নাই, সেবার ধর্ম্মও নাই, কল্যাণের ইঙ্গিতও নাই। ইহার পতাকার তলে যাঁহারা সমবেত হইয়াছেন তাঁহারা পরস্পরের গলায় জড়াইতে চাহিয়াছেন বন্ধনের রজ্জু ; ভোগের দ্বারা সেবাকে তাঁহারা ব্যাহত করিতেছেন ; স্বার্থের যূপকাষ্ঠে তাঁহারা বলি দিতেছেন শাশ্বত কল্যাণের আদর্শকে !

বস্তুতঃ এই যান্ত্রিক সভ্যতার আবর্ত্তনের ফলেই গোলা ভরা গম মজুত থাকিতেও অনাহারে মরে দুনিয়ার কোটি কোটি লোক—ধনিকদের চক্ষু তাহাতে সজল হইয়া উঠে না , লক্ষ লক্ষ নর-নারী নগ্ন থাকে, অথচ তুলার দাম বাড়াইবার জন্য পরিকল্পনা চলে তুলার স্তূপে অগ্নি-সংযোগের।

ধন সঞ্চয় অন্যায় নহে—অন্যায় ধনের অপব্যবহারে। এই ধনিক সভ্যতা যে ভাবে ধনের ব্যবহার করিতেছেন অন্যায় তাহারই ভিতর দিয়া পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে। হাজার হাজার লোককে পথে বসাইয়া তাঁহারা সঞ্চয় করিতেছেন অর্থ, আর সেই ধনের দ্বারা চলিয়াছে তাঁহাদের ভোগ-বিলাসের উপাসনা। আজ যাহা তাঁহাদের কাছে বিলাস, ভোগের স্রোতে গা

ভাসাইয়া দেওয়ায় দু'দিন পরেই তাহা তাঁহাদের কাছে প্রয়োজনীয় বস্তু হইয়া দাঁড়ায়। এইরূপে ভোগের ক্ষুধা বাড়াইতে বাড়াইতে তাঁহারা আজ যেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন সেখান হইতে চারিপাশের দুঃখের দিকে, হাহাকারের দিকে নজর দিবার তাঁহাদের শক্তিও থাকে না—ইচ্ছাও থাকে না।

বণিক সভ্যতার এই রূপ এখনও ভারতের কাছে নূতন। নূতন বলিয়া এক দিকে যেমন তাহার প্রতি লোকের একটা আকর্ষণ আছে—মোহ আছে, তেমনি এখন পর্যান্ত তাহা লোকের মজ্জাগত হইতে পারে নাই বলিয়া ভারতবর্ষ হইতে তাহাকে উৎখাত করাও অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু উৎখাত করিতে হইলে এই সভ্যতার দ্বারা মানুষ ধ্বংসের পথে যে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে তাহাই বোঝা দরকার—এই যান্ত্রিক সভ্যতার মোহ হইতে তাহার মুক্ত হওয়া আবশ্যক। সভ্যতার এই প্রলোভন হইতে ভারত যদি মুক্তি লাভ করিতে পারে, জগতের মুক্তির পথও সে আবিষ্কার করিতে পারিবে।

দ্বিতীয় ভাগ।

বস্ত্রশিল্পের হাতিয়ার

অন্ন ও বস্ত্র এই দুইটি জিনিষের প্রয়োজন সমস্ত দেশের পক্ষেই প্রায় সমান। ইহাদের একটিকে ছাড়িয়া দিলে মানুষ বাঁচিতে পারে না, আর-একটিকে ছাড়িয়া দিলে সমাজ অচল হইয়া উঠে। খাদ্যের প্রয়োজন অবশ্য প্রাকৃতিক নিয়মেই অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু বসনের প্রয়োজন মানুষের নিজ-হাতে গড়া। নিজের হাতে গড়া এই জিনিষটির উপর মানুষ তাহার প্রয়োজনের পর্দ্দা এমন ভাবেই টানিয়া দিয়াছে যে, খাদ্যকে যদি বা দুই একদিন বাদ দিলে চলে, বসনকে একমুহূর্ত্তও বাদ দেওয়া চলে না। সৃষ্টির আদিম যুগে যাহা ছিল না, সভ্যতার গোড়া-পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে হয়তো বা কতকটা বিলাসের দিক্ দিয়াই যাহার সৃষ্টি সুরু হয়, আজ সেই বিলাসের উপকরণ অতি প্রয়োজনীয়, অপরিহার্য্য জিনিষের তালিকার ভিতর আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সভ্যতার রথ যন্ত্র-মুখরিত রাজপথে ধূলি উড়াইয়া যতই অগ্রসর হইতে থাকিবে, বস্ত্রের উপাদানে নূতন নূতন বিলাস-পণ্যের রসদ জোগাইবার কাজ হয়তো ততই বাড়িয়া উঠিবে। জীব-জগতের ল্যাজ দুনিয়ার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে খসিয়া পড়ে—বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে প্রকৃতির সভ্য করিয়া তোলার এম্নি-একটি ইতিহাস নাকি ধরা পড়িয়াছে, কিন্তু মানুষ যে সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহাতে যে প্রয়োজনের

লেজুড় একবার জুড়িয়া দেওয়া হয়, তাহার ছাঁটা বা কাটা পড়িবার কোনই সম্ভাবনা থাকে না। সে ল্যাজ হনুমানের ল্যাজের মতো

"বাড়িয়া উঠিছে ঊর্দ্ধে পঞ্চাশ যোজন!"

আর তাহার উপর একটা আবরণ রচনা করিবার জন্য

"ভারে ভারে বস্ত্র সবে আনিছে নিকটে।
এত বস্ত্র আনে এক বেড় নাহি আঁটে॥"

এ যুগের মানুষ আজ আর কল্পনাও করিতে পারে না যে, আবার কথনো এমন দিন ফিরিয়া আসিবে, যখন ঠিক্ আদিম যুগের মতোই বস্ত্রের প্রয়োজন খসিয়া পড়িবে। বস্ত্রের প্রয়োজন যখন এমনি অপরিহার্য্য তখন তাহার জন্য কোনো দেশের চাহিদা যাহাতে সেই দেশের ভিতর হইতেই পূর্ণ হয়, তাহারও ব্যবস্থা থাকা দরকার। World-Republic (বিশ্ব-জন-তন্ত্র) Universal Brotherhood (বিশ্ব-মৈত্রী) ইত্যাদি বড় বড় কথার উপর নির্ভর করিয়া নিজের দেশের কাঁচা মালের বিনিময়ে ভারতবর্ষকে পরের দেশের বাণিজ্য-পণ্য বিকাইবার বাজারে পরিণত করিবার কোনোই সার্থকতা নাই। Imperial Preference-এর (সাম্রাজ্যগত পক্ষপাত) যে ধুয়া আজ উঠিয়াছে, তাহাতে সাম্রাজ্যের আর সকল অংশের সুবিধা হইলেও ভারতবর্ষের যতদিন রাজনৈতিক ব্যাপারে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা না পায় ততদিন তাহার অবস্থার যে কোনো পরিবর্ত্তন হইবে না তাহাও জানা কথা। সুতরাং পক্ষপাত (Preference) যদি কাহাকেও দেখাইতেই হয়, তবে সকলের আগে নিজের দেশকেই দেখানো উচিত—এ কথা বলিলে হয় তো আজিকার এই আদর্শ লইয়া নাড়াচাড়ার দিনেও তাহা অন্যায় বলিয়া মনে হইবে না।

ভারতবর্ষের বস্ত্র-শিল্পের পুনরুদ্ধারের তুইটি মাত্র পথই কেবল খোলা আছে—একটি কাপড়ের মিলের প্রতিষ্ঠার দ্বারা, দ্বিতীয়টি চরকার প্রবর্ত্তনের দ্বারা। বস্ত্র-সমস্যা সমাধানের জন্য জাতির মনের ভিতর একটা গুরুতর রকমের তাগিদ্ যখন একবার জাগিয়াছে, তখন তুই পথের কোন্ পথ যে গ্রহণ-যোগ্য সে সম্বন্ধেও একটা চূড়ান্ত রকমের মীমাংসা এই সময়েই হওয়া সঙ্গত। উভয় পথের সুবিধা-অসুবিধা বিশেষভাবে বিচার করিয়া না দেখিয়া কাজে নামিলে, সব কাজেই যেমন পস্তাইতে হয়, এ ক্ষেত্রেও হয়তো তেমনি পস্তাইতে হইবে। উপরন্তু যে আন্দোলনটা দেশের নিঃসাড় মনের উপর একটা ধাক্কা দিবার জন্য সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাও সফল করিয়া তোলা সম্ভব হইবে না।

ব্যবহারিক দিক হইতে বিচার করিয়া দেখিলে মিলের একটা সুবিধার কথাই সকলের আগে মনে পড়ে—মিলের কাপড়ের একছাঁদের বুনানীর কথা। যে যে-রকমের কাপড় পরিতে অভ্যস্ত, তাহার সেইরকমের কাপড়ের চাহিদাই মিল অতি সহজে মিটাইতে পারে। মানুষ দীর্ঘ দিন ধরিয়া যে জিনিষে অভ্যস্ত হইয়া উঠে, তাহার জন্য তাহার একটা ঝোঁক থাকা স্বাভাবিক। এ ঝোঁকের হাত হইতে যদি কেহ হঠাৎ আপনাকে মুক্ত করিতে না পারে, তবে সেজন্য তাহাকে দোষও দেওয়া যায় না। তাহা ছাড়া মুক্ত করিবার কারণ যদি খুব গুরুতর না হয়, তবে সেজন্য কোনো লোকের উপর জোর-জবরদস্তি চালাইলেও তাহা অন্যায় হয়। সুতরাং মিলকে বাদ দিয়া অন্য পথটিকেই যদি গ্রহণ করিতে হয় তবে ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখিতে হইবে, এই পথে মিলের ব্যবহারিক সুখ-সুবিধার চাহিদা মিটিবার সম্ভাবনা আছে কি না। আর যদি না থাকে, তবে অন্য সব সুখ সুবিধা এত বেশী কি না, যাহার জন্য ইহার ব্যবহারিক অসুবিধাটাকেও অগ্রাহ্য করা চলে।

এই প্রসঙ্গে বছর-পচিশ আগের কথা মনে পড়ে। স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ যখন বাংলার এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যান্ত বন্যার মতো বহিয়া গিয়াছিল এবং বিদেশী-বর্জ্জনের উত্তেজনার মদে বাংলার তরুণ মন মাতাল হইয়া উঠিয়াছিল, তখন এই বস্ত্র-সমস্যাই ছিল সে মাতামাতির দিনেরও বিশেষ হাতিয়ার। চরকা এবং মিল—এই দুইটি জিনিষই সেই প্রথম স্বদেশী ভাবের দিক হইতে আমাদের মনে ঘা দিতে সুরু করে। একান্ত ঘরোয়া চেহারার চরকা সেদিন দু'দণ্ডের অতিথির মতো আমাদের মনকে চঞ্চল করিয়া তুলিলেও আমাদের মনের ভিতর স্থায়ী আসন সে গাড়িতে পারে নাই। পাশ্চাত্য সভ্যতার ছায়ালোকে ঘেরা আমাদের মনের দুয়ারে মিল সেদিন যে শঙ্খনাদ করিয়াছিল. সেই শঙ্খনাদে মিলের পিছনেই আমরা ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিলাম। আজ আবার যদি মিলকে বাদ দিয়া চরকার হাতছানিতেই ছুটিতে হয়, তবে তাহার আকর্ষণ মিলের অপেক্ষাও জোরালো না হইলে মানুষের মন যে তাহাতে সাড়া দিবে না তাহা সুনিশ্চিত।

মহাত্মা গান্ধী চরকাকে ভারতবর্ষের সমস্ত রকম নাগপাশের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের হাতিয়াররূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতের সঙ্গে হয়তো সকলের মত মিলিবে না। রাজনৈতিক উপযোগিতা দূরের কথা, অর্থনৈতিক উপযোগিতা লইয়াও হয়তো মতদ্বৈধের সৃষ্টি হইবে। বিশেষতঃ মহাত্মা গান্ধীর আঘাত ঠিক যুক্তির আঘাতও নহে, তিনি আঘাত করিয়াছেন বিশেষভাবে ভাবের দিক হইতে। ভাবের আঘাত একেবারে পৌরাণিক যুগের পরশপাথরের আঘাতের মতো। যাহার ভিতর সে পরিবর্ত্তন আনিতে পারে, তাহাকে একেবারে খাঁটি সোনায় পরিণত করিয়া

রাখিয়া যায়। কিন্তু যাহার উপর পরশ পাথরের প্রভাব নাই, দুনিয়ায় তেমন জিনিষও আছে। যাহা ধাতুদ্রব্য নহে, যাহা ইট, কাঠ, পাথরের মতো জিনিষ, তাহাতে পরশ পাথর ঠেকাইলেও তাহার বিশেষ কোনো পরিবর্ত্তন হয় না। সেগুলির ভিতর কোনো পরিবর্ত্তন আনিতে হইলে অন্য রকমের ব্যবস্থা দরকার। ভাব বোঝে না অথচ যুক্তি বোঝে, দুনিয়ায় এরূপ লোকের সংখ্যা একেবারে অল্প নয়।

ভাবের এই মহাসমুদ্রে অবগাহন করিয়াও মিলের উপযোগিতা সম্বন্ধে যাঁহাদের মতের পরিবর্ত্তন হয় নাই, তাঁহারা সাধারণতঃ একেবারে বস্তু-জগতের লোক। লাভ-ক্ষতির পরিমাণ লইয়া তাঁহাদের হিসাবের খাতা তৈরী হয়। খাতার হিসাবের বাহিরে পা বাড়াইতেও তাঁহারা নারাজ। তাঁহাদিগকে বুঝাইতে হইলে লাভ-লোকসানের কষ্টিপাথরে কষিয়া তাঁহাদের খাতার অঙ্ক যে ভুল, তাহাই বুঝাইয়া দেওয়া ছাড়া অন্য আর কোনো উপায় নাই। এবারকার আন্দোলনের সম্পর্কেও খাতা খুলিয়া তাঁহারা লাভ-লোকসানের হিসাব লইয়া বসিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন— কাপড়ের আন্দোলনে জোর দেওয়ার অর্থ বস্ত্রের জন্য প্রতিবৎসর যে ৬০।৭০ কোটি টাকা বিদেশের মালখানায় যাইয়া মজুত হইতেছে, তাহার পথ বন্ধ করা। দেশী মিলের উপরে যদি নির্ভর করা যায়, তাহা হইলেও এই অর্থ দেশে থাকে। দেশী লোকের মূলধনে যে মিল প্রতিষ্ঠিত, দেশী মজুরের দ্বারা যে মিল চলে, দেশী বিশেষজ্ঞ ও কর্ম্মচারীদের দ্বারা যে মিলের তত্ত্বাবধান হয়, এবং দেশের লোক যাহার লাভের অংশ ভোগ করে তাহাকে বর্জ্জন করিবার কোনোই সার্থকতা নাই। যুক্তি লইয়াই যদি নাড়াচাড়া করিয়া দেখিতে হয়, তবে এ যুক্তিটা বিশেষভাবেই যাচাই

করিয়া দেখা আবশ্যক। কারণ এ যুক্তি যাঁহারা দেন তাঁহারা কেবল দলেই ভারী নহেন, যুক্তির ভিতরও তাঁহাদের জোর আছে।

ভারতবর্ষের বস্ত্রশিল্পের এই লাভ-ক্ষতির প্রশ্নটাকে নানাদিক হইতে পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়। সূতা, মিলের কল-কব্জা, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরাধীনতা, অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা—এ সমস্তেরই হিসাব না গণিয়া তাহার পরীক্ষা শেষ করা চলে না। সূতার কথাটাই আগে ধরা যাক্। বস্ত্রে স্বাবলম্বী হইতে হইলে ভারতবর্ষকে সূতাতেও স্বাবলম্বী হইতে হইবে। কিন্তু ভারতবর্ষ সূতাতে যে স্বাবলম্বী নয়, আমদানি-রপ্তানির হিসাব-নিকাশটাই তাহার প্রমাণ।

বিদেশী সূতার আমদানি

বৎসর	সূতার ওজন (পাউণ্ড)	সূতার দাম (টাকা)
১৯১৪	৪৪১৭১০০০	৪১৬০০০০০
১৯১৮	১৯৪০০০০০	৪২৯৫২০০০
১৯১৯	৩৮০৯৫০০০	৮৩৬৬৩০০০
১৯২০	১৫০৯৭০০০	৪৩৫৯৫০০০
১৯২১	৪৭৩৩৩০০০	১৩৫৭৮৩০০০
১৯২২	৫৭১২৫০০০	১১৫১২২০০০
১৯২৩	৫৯২৭৪০০০	৯২৫৮৫০০০
১৯২৮	৫২৩৪৫০০০	৬৭৮৯৯০০০
১৯২৯	৪৩৭৬৬০০০	৬২৮৭৯০০০

কলে বস্ত্র-বয়নই যদি চলিতে থাকে, তবে বিদেশ হইতে সূতার এই আমদানি বন্ধ করা সম্ভব হইবে কি না, সে সম্বন্ধে সকলের আগে

নিঃসন্দেহ হওয়া দরকার। উপরোক্ত তালিকায় দেখা যাইতেছে যে, ভারতবর্ষের খদ্দর আন্দোলনের এই মরশুমের দিনেও বিদেশী সুতার আমদানি বিশেষ কমে নাই। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে যাহার পরিমাণ ছিল ৪ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড, ১৯২৯ সালেও তাহার পরিমাণ ৪ কোটি ৩৭ লক্ষ পাউণ্ডই রহিয়া গিয়াছে। গত দুই বৎসরের হিসাব পাই নাই। তাহাতে পরিমাণটা হয়তো আরো কিছু কম হইতে পারে। কিন্তু এ দুই বৎসরের অবস্থা এতই অস্বাভাবিক যে তাহার উপর কোনো রকমের জোর দেওয়া যায় না।

বিদেশী সুতার আমদানি ভারতবর্ষে এত হয় কেন? এই 'কেন'র জবাব নানারকমে দেওয়া চলে। একটি জবাব হইতেছে এই—ভারতবর্ষে তুলা যথেষ্ট জন্মিলেও লম্বা আঁশের তুলা জন্মায় না। ল্যাঙ্কাশায়ার, ম্যাঞ্চেষ্টার প্রভৃতি স্থানের মিলগুলির জন্য দেখা যায় লম্বা আঁশের তুলা অপরিহার্য্য। ল্যাঙ্কাশায়ার, ম্যাঞ্চেষ্টারের মিলে যাহা অপরিহার্য্য, দুনিয়ার সমস্ত মিলেই তাহা অপরিহার্য্য হওয়া অসম্ভব নয়। মিলের বস্ত্রের উপর নির্ভর করিতে হইলে অন্ততঃ মিলের সাহায্যে বস্ত্র-শিল্পকে পরিপূর্ণতা দান করিতে হইলে অন্য দেশের লম্বা আঁশের তুলার উপরেও খানিকটা নির্ভর করিতে হইবে। সুতরাং সুতার সম্বন্ধে স্বাবলম্বী হওয়ার এখানেও একটা বড় রকমের বাধা আছে বলিয়া মনে হয়।

তুলার সম্বন্ধে অন্য দেশের উপর এই যে নির্ভরতা—ইহার দুঃখ এবং অনিশ্চয়তা যে কত বড়, ইংলণ্ডের বস্ত্র-শিল্পের আগাগোড়ার ইতিহাসটা আলোচনা করিলে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বস্ত্র-শিল্পই ইংলণ্ডের

জীয়নকাঠি মরণকাঠির মতো। অথচ তুলা সে নিজের দেশে জন্মাইতে পারে না—তুলার জন্ম তাহাকে দ্বারস্থ হইতে হয় আমেরিকার দ্বারে। আমেরিকা রপ্তানি বন্ধ করিলে ইংলণ্ডের কলগুলির অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয় হইয়া উঠে, আমেরিকান যুদ্ধের সময় তাহার প্রমাণ ইংরেজ একবার পাইয়াছে, অদূর ভবিষ্যতে আবার হয়তো আরো ভালো করিয়া পাইবে। কারণ আমেরিকা আর খুব বেশী দিন যে ল্যাঙ্কাশায়ারের কলগুলিতে তাহাদের চাহিদা অনুসারে তুলার জোগান দিবে না, আজ তাহা অতিমাত্রায় সুস্পষ্ট। ১৯০৭ সালে আমেরিকার কৃষি-বিভাগের ডিরেক্টর (Director of the Bureau of Agriculture) ইউরোপের বস্ত্র-ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিদের নিকট স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন:—

"আমি বিশ্বাস করি, ভবিষ্যতে এমন দিন নিশ্চয়ই আসিবে যখন যুক্তরাজ্য তাহার তুলার দুই-তৃতীয়াংশ ভাগ রপ্তানি না করিয়া নিজের দেশেই তাহার অধিকাংশ বস্ত্র নির্ম্মাণে ব্যয় করিবে এবং এই বস্ত্র-শিল্প যে কত বড় লাভের ব্যবসা তাহাও অনুভব করিতে সক্ষম হইবে।"

তাঁহার এই নীতির ইঙ্গিত আমেরিকা কতটা যে কাজে পরিণত করিয়াছে তাহার পরিচয় দিয়াছেন মিঃ জি, বিগউড্*। তিনি তাঁহার 'Cotton' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন:—

"১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরে যুক্তরাজ্যে তুলার ফলনের মোট পরিমাণ ছিল ৮০ লক্ষ বেল। পরের পাঁচ বৎসরে এই পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৯০ লক্ষ বেলে দাঁড়াইয়াছিল। ফলনের দিক দিয়া ১০ লক্ষ বেল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমেরিকায় বস্ত্র-শিল্পের ক্ষেত্রটাও বাড়িয়া উঠে।

পূর্ব্বে যেখানে ২০ লক্ষ বেল তাহার নিজের দেশে বস্ত্র-শিল্পে প্রয়োজন হইত, সেইখানে সেই বৎসর ২৫ লক্ষ বেল সে নিজের দেশেই বস্ত্র-নির্ম্মাণে ব্যয় করিয়াছে। অর্থাৎ তাহার বাড়্তি উৎপন্নের অর্দ্ধেক সে লাগাইয়াছে নিজের দেশের বস্ত্র-শিল্পে। ইহার ফলে দুনিয়ার কাঁচা মালের জোগানে তুলার পরিমাণ ঢের কম পড়িয়া গিয়াছিল। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় যে তুলা উৎপন্ন হয়, তাহার পরিমাণ ছিল মোট ৯৫ লক্ষ বেল। সে বৎসর ল্যাঙ্কাশায়ারের অনেক মিলকেই তুলা কম পড়ায় কাজের সময় কমাইয়া দিতে হইয়াছিল। সুতরাং মূলধন এবং মজুর উভয় দিক দিয়াই ল্যাঙ্কাশায়ারকে ক্ষতির ঝক্কি সহ্য করিতে হইয়াছে। তাহার পর বর্ত্তমানের দিকে যতই অগ্রসর হওয়া যায়, ততই দেখা যায়, আমেরিকার কল-কারখানাগুলিতে তুলার খরচ ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯১৩-১৪ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় ৫৫ লক্ষ বেল, ১৯১৪ ১৫ খৃষ্টাব্দে ৬০ লক্ষ বেল এবং ১৯১৫-১৬খৃষ্টাব্দে ৭২,৫০,০০০ বেল তুলার প্রয়োজন হইয়াছে। সুতরাং ইংলণ্ডের পক্ষে তাহার উপনিবেশ ও অধীনস্থ রাজ্যগুলিতে তুলা উৎপন্ন করা অর্থনীতি ও বাণিজ্যনীতি—এই উভয় দিক দিয়াই যে অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। দুনিয়ার বস্ত্র-শিল্পের উপযোগী তুলার জন্য একটি দেশের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকাও সমীচীন নহে। যখন তুলার কাঁচা মালের যোগান পাওয়া না যায়, তখন এ দেশের কল-কারখানাগুলির অবস্থা যে কিরূপ নিঃসহায় ও শোচনীয় হইয়া উঠে, তাহার প্রমাণ আমেরিকার অন্তর্বিপ্লবের সময়েই পাওয়া গিয়াছে।"

ইংলণ্ডে তুলা জন্মায় না, কিন্তু ভারতবর্ষে তুলার ফলন বড় অল্প নহে। সুতরাং অনেকে হয়তো মনে করিতে পারেন লম্বা আঁশের তুলার জন্য ইংলণ্ডের

যে বিপদ, ভারতবর্ষের পক্ষে সে বিপদ নিছক কল্পনা মাত্র। কিন্তু ইহা কে কেবল কল্পনা নহে তাহারও চূড়ান্ত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। আমেরিকার হাতে মার খাইয়া ইংরেজেরা ভারতবর্ষে লম্বা আঁশের তুলা জন্মাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু অজস্র অর্থ-ব্যয় করিয়াও তাঁহাদের সে চেষ্টা সফল হয় নাই। ভারতবর্ষের মাটি লম্বা আঁশের তুলার বীজ ধারাবাহিকভাবে উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছে। ১৮১৯ সালে কোর্ট অব্ ডিরেক্টর্‌স্ যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে কথাটা স্পষ্ট করিয়াই স্বীকার করা হইয়াছে :—

"আমরা ব্রিটিশ ভারতে বিদেশী ধরণের তুলা উৎপন্ন করিবার চেষ্টা বহু বৎসর ধরিয়া করিয়াছি এবং তাহাতে অকৃতকার্য্য হওয়ার অনুশোচনাও ভোগ করিতেছি।"

মিঃ মার্কারের মতও এই মতেরই পরিপোষণ করে :—

"এই সব পরীক্ষা-কেন্দ্রে গবর্ণমেণ্টের ব্যয় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে, আমেরিকার পদ্ধতি ভারতবর্ষে অবলম্বন করা সম্ভবপর হয় নাই। ভারতবর্ষের কৃষকদের দেশের আব্‌হাওয়া ও জমির শক্তি সম্বন্ধে বেশ একটা সুস্পষ্ট ধারণা আছে। আর তাহারই ফলে তাহারা ইউরোপীয়ানদের অপেক্ষা ঢের কম খরচে ক্ষেতে ফসল উৎপন্ন করিতে পারে।"

মিঃ মার্কারের এ কথা জোর করিয়া বলিবার অধিকার যে কাহারও অপেক্ষা কম নয় তাহা বলাই বাহুল্য, কারণ ভারতবর্ষের তুলার উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্ট যে সব বিশেষজ্ঞের আমদানি করিয়াছিলেন তিনি ছিলেন তাঁহাদেরই একজন।

'খাদি ম্যানুয়েলের' দ্বিতীয় খণ্ডে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত লিখিয়াছেন :—

"গবর্ণমেণ্ট তুলার চাষের উন্নতির জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের মাটির উপাদান বিশ্লেষণ করিয়া আমেরিকার মাটির সহিত তুলনা-মূলক আলোচনাও এই সম্পর্কেই সুরু হয়। কিন্তু এত চেষ্টাতেও অবস্থার বিশেষ কোনো পরিবর্ত্তনই সাধিত হয় নাই। * * * ভারতবর্ষের ধীর-মন্থর গতিতে হতাশ হইয়া সাম্রাজ্যের অন্যত্র লম্বা আঁশের তুলা উৎপন্ন করিবার চেষ্টাতেই এখন তাঁহারা বিশেষভাবে মনোনিবেশ করিয়াছেন।"

এই অন্বেষণের ফলে ইংরেজের মতো শক্তিশালী জাতির তুলার চাহিদা হয়তো মিটিতে পারে এবং তাহার সম্ভাবনাও হয়তো দেখা দিয়াছে। সুদান লইয়া এই যে এত হানাহানি, তাহা ইংরাজের নেহাৎ নিঃস্বার্থ প্রেম নহে। "Daily Express"-এর একটি প্রবন্ধের কয়েকটি পংক্তির উপর দৃষ্টি দিলেই এই হানাহানির অর্থ বোঝা যায়ঃ—

"সুদানে নানাস্থানে পরীক্ষার দ্বারা বেশ স্পষ্টরূপেই প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে সুদান পৃথিবীর উর্ব্বরতম স্থানগুলির অন্যতম। ইতিমধ্যেই তাহার ২০,০০০ একার জমিতে তুলার চাষ চলিয়াছে। সুদানে প্রায় ৩০ লক্ষ একার জমি চাষ-আবাদের যোগ্য। প্রথমে এই স্থানের দশ ভাগের এক ভাগ জমিতে অর্থাৎ ৩ লক্ষ একার জমিতে জল-সেচনের ব্যবস্থা করা হইবে। তাহাতে বৎসরে প্রায় ৪ কোটি পাউণ্ড তুলার ফসল ফলিতে পারে। বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন, এক পুরুষের ভিতরেই ফসলের পরিমাণ ১০ লক্ষ বেলে গিয়া দাঁড়াইবে! ১০ লক্ষ বেল তুলার দাম দুই কোটি পাউণ্ড। * * * সুদানের বন্দর হইতে এই তুলা ইংরেজের জাহাজে লণ্ডন এবং লিভারপুলে প্রেরিত হইবে।"

সুদানের এই জমিগুলি চাষের উপযোগী হইয়া উঠিলে ল্যাঙ্কাশায়ারের তুলার জন্য ইংরেজের বিপদ্ হয়তো কাটিবে, কিন্তু ভারতবর্ষের মিলের চাহিদা মিটিবার উপযোগী তুলা তাহাতেও মিলিবে না। মিলের কথা বিশেষভাবে বলার তাৎপর্য্য এই যে, ভারতবর্ষে যে তুলা জন্মায়, তাহাতে চরকায় সূতা কাটিয়া বস্ত্র বুনিলে এমন সূক্ষ্ম বস্ত্রও তৈরী হইতে পারে মিল যাহা বুনিবার কল্পনাও করিতে পারে না। মসলীন প্রভৃতি ভারতবর্ষের তুলার সূতাতেই তৈরী হইত। সুতরাং মনে রাখিতে হইবে, লম্বা আঁশের তুলা লইয়া যে সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা কেবলমাত্র মিলের সম্পর্কেই, চরকার সহিত তাহার কোনো সম্পর্ক নাই। ভগবানের দেওয়া হাতে এবং মানুষের তৈরী মিলে এইখানেই তফাৎ। অবশ্য মিলে যদি কেবল মোটা সূতার বস্ত্রই তৈরী করিতে হয়, তবে ভারতবর্ষের ঘাড়ে এ বিপদের বোঝা হয়তো না-ও চাপিতে পারে। কিন্তু শিল্প সম্বন্ধেই হোক্, অথবা আর যে-কোনো সম্বন্ধেই হোক্, কোনো বিশেষ পথ অবলম্বনের পূর্ব্বে সে পথের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাও বিচার করিয়া দেখা দরকার। ভারতবর্ষ নিজের উপর নির্ভর করিয়া মিলের দ্বারা তাহার বস্ত্র-শিল্পকে যদি সম্পূর্ণতা দান করিতে না পারে, তবে সে পথ আর যাহাই হোক্, তাহার গন্তব্য পথ যে নহে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

তুলার এবং সূতার এই পরাধীনতার কথা ছাড়িয়া দিলেও মিলের বস্ত্রের সম্পর্কে ভারতবর্ষের পরাধীনতার জের মিটে না। বস্ত্রের জন্য মিলের উপরেই যদি ভারতবর্ষকে নির্ভর করিতে হয়, তবে আর এক দিক দিয়া এমন আর একটা পরাধীনতার জোয়াল তাহার ঘাড়ে চাপে যাহার ভারও বড় সহজ নহে। সে চাপ কল-কারখানা, লোহা-লক্কড়ের। কল-

কব্জা তৈরীর উল্লেখযোগ্য কারখানা ভারতবর্ষে কেবলমাত্র একটিই আছে—টাটার লোহা-ইস্পাতের কারখানা। সেটিকে শিবরাত্রির সলিতার মতো নানা জোড়-তোড় দিয়া সাহেব-মিস্ত্রিদের সাহায্যেই নাকি কোনো রকমে জীয়াইয়া রাখা হইয়াছে। সমগ্র ভারতবর্ষের বস্ত্রের চাহিদা মিটাইতে হইলে যতগুলি কল-কারখানা প্রতিষ্ঠা করা দরকার তাহার উপাদান যোগাইবার সামর্থ্য টাটার কারখানার নাই। একটি মিল প্রতিষ্ঠায় কত টাকার 'মেশিনারি' লাগে, তাহার সম্বন্ধে আমাদের ধারণা সম্ভবতঃ খুবই অল্প। সুতরাং ভারতবর্ষের কাপড়ের কলগুলিতে প্রতিবৎসর যত টাকার 'মেশিনারি' আসে, তাহার একটা আভাস দিলে, হয় তো তাহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

মেশিনারীর আমদানী

কাপড়ের কলে

		১৯২২	১৯২৩
সূতাকাটার যন্ত্র	...	৬৪২৩১৩৮১	৫২২০১৭৩৮
বয়ন যন্ত্র	...	১৭৮৪৪৮৪২	১২৬৬৩৪৫০
রং করার যন্ত্র	...	১৭০৫৪৫৪	৭৪৬০০০
ছাপের যন্ত্র	..	২৫০২০	৭৮৩৩
অন্যান্য রকমের যন্ত্র	...	৫৩৩১৯২৯	৪৬৮৪৫৭৮
মোট		৮,৯১,৩৮,৬২৬	৭,০৩,৪৩,৯৯৯

সুতরাং মিলের প্রতিষ্ঠার দ্বারা ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পকে স্বাধীনতা দেওয়ার কোনো রকমের সম্ভাবনা তো নাই-ই, উপরন্তু এই সব 'মেশিনারির' জন্য

একটা বিপুল অঙ্ক অযথা হয় তো ভারতবর্ষকে ব্যয় করিতে হইবে। যাঁহারা বলেন, কাপড়ের কলের প্রতিষ্ঠার দ্বারা দেশের অর্থ বাহিরে যাইবার সম্ভাবনা নাই, এই সব যুক্তির মাপকাঠিতে মাপিয়া দেখিলে তাঁহাদের কথার বিশেষ কোনো দাম খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

তাহা ছাড়া দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাটাও একেবারে অবহেলার জিনিষ নহে। ভারতবর্ষের দারিদ্র্য অপরিসীম। এক-একটি মিলের প্রতিষ্ঠায় ও পরিচালনায় যে অর্থের প্রয়োজন হয় তাহার ব্যয়ের কড়ি গণিয়া এ দেশের পক্ষে বহু মিলের প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর কি না তাহাও ভালো করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিবার বিষয়। কয়েকটি কাপড়ের কলের ব্যয়ের অঙ্কটা আমরা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। এত অর্থ ব্যয় করিয়া এ দেশের কয়টি কল প্রতিষ্ঠিত করিবার ক্ষমতা আছে, এই অঙ্কগুলির দিকে নজর দিলে দেশের লোকের সে সম্বন্ধে একটা ধারণা হয় তো গড়িয়া উঠিতে পারে।

মিলের নাম	মূলধনের পরিমাণ
সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া স্পিনিং উইভিং এণ্ড ম্যানুফ্যাক্চারিং কোং ..	৯৬,৮৭,৫০০
কেশোরাম কটন মিলস্ লিঃ ..	৮০,০০,০০০
ই, ডি, সেসুন ইউনাইটেড মিলস্ লিঃ .	১০,০০,০০,০০০
নিউ ভিক্টোরিয়া মিলস্ কোং লিঃ .	৫,০০,০০,০০০
ডান্‌বার মিলস্ কোং ..	৫০,০০,০০০
সাউথ ইণ্ডিয়া ইণ্ডাস্ট্রিয়াল্‌স্ ..	৩০,০০,০০০
বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল্‌স্	১৮,০০,০০০

অর্থনীতির দিক দিয়া মিলের হাতে ভারতবর্ষের বস্ত্র-সমস্যার ভার ছাড়িয়া দেওয়ার এতগুলি প্রতিবন্ধক আছে। ইহা ছাড়া অন্যান্য প্রতিবন্ধকও নিতান্ত কম নয়। মিলের সহিত প্রতিযোগিতার নিত্য-সম্বন্ধ। মিলের প্রতিষ্ঠার দ্বারা ভারতবর্ষের বস্ত্র-সমস্যার যদি সমাধান করিতে হয়, তবে এ দেশের মিলগুলিকেও প্রতিযোগিতায় বিদেশের, বিশেষভাবে ইংলণ্ডের মিলগুলিকে পরাজিত করিয়াই টিকিয়া থাকিতে হইবে। এইরূপ জয়লাভের অর্থ কি তাহা সহজেই অনুমেয়। বস্ত্র-শিল্পের উপর বিলাতের ভবিষ্যৎ কতখানি নির্ভর করে, গত কয়েক বৎসরের খবরের কাগজগুলি যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহারা তাহার পরিচয় নিশ্চয়ই পাইয়াছেন। যুদ্ধের জন্য এবং ভারতবর্ষের স্বদেশী আন্দোলনের দৌলতে যখনই ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড়ের কলগুলিতে বস্ত্রের চাহিদায় কমতি পড়িয়াছে, সমস্ত গ্রেটব্রিটেন জুড়িয়া তখনই হাহাকার জাগিয়া উঠিয়াছে। সেই হাহাকারের চাঞ্চল্যের ধাক্কায় এই কয় বৎসর ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্টের এতটুকুও সোয়াস্তি ছিল না। তাহার কর্তৃত্বের ভার এইজন্যই ইতিমধ্যে যে কতবার হাত বদলাইয়া লইয়াছে, তাহার ইতিহাসও খবরের কাগজ যাঁহারা নিত্য-নিয়মিতভাবে পড়েন তাঁহাদের অজানা নাই। ল্যাঙ্কাশায়ারের মিলের সাফল্যের উপর যে দেশের ভবিষ্যৎ এতখানি নির্ভর করে, ভারতবর্ষ সেই দেশের কাছেই পরাধীন। সুতরাং মিলের ব্যাপার লইয়া এই দুইটি দেশ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে যখন মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইবে, তখন ইংরেজের উদারতার মুখোষ যে একান্ত নির্লজ্জভাবেই খসিয়া পড়িবে না, একথা আজ কেহই হলপ করিয়া বলিতে পারে না। ইংরেজের উদারতাও এ দিক দিয়া বড় বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। কারণ যে

সামান্য একটু প্রতিযোগিতা আজ চলিয়াছে, তাহারই ফলে ইতিমধ্যেই তাঁহারা ভারতবর্ষের কার্পাস-শিল্পের উপর Excise Duty, Supertax প্রভৃতি নানা ট্যাক্সের বোঝা চাপাইয়া দিয়াছেন। এই ট্যাক্সগুলির স্বরূপ যে কি 'খাদি ম্যানুয়ালের' ভিতর হইতেই তাহারও আভাস পাওয়া যায়।

"ল্যাঙ্কাশায়ারের মিলের সহিত ভারতীয় মিলের প্রতিযোগিতা বন্ধ করিবার জন্য যে নীতি অবলম্বন করা হইয়াছিল তাহা তখনই চরমে আসিয়া উপস্থিত হইল, যখন ম্যাঞ্চেষ্টারের স্বার্থের খাতিরে ভারতবর্ষের ব্যবহারের জন্য ভারতের মিলে প্রস্তুত বস্ত্রের উপরেও ট্যাক্স বসিল। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের Cotton Duties Act-এর দ্বারা ভারতীয় মিলের তৈরী বস্ত্রের উপর শতকরা ৩॥০ টাকা ট্যাক্স বসাইয়া ভারতীয় কৃষকদের অবস্থা শোচনীয় করিয়া তোলা হইয়াছে। * * * কাপড়ের মিল হইতে গবর্ণমেণ্ট প্রতিবৎসর শুল্ক বাবদ ১·৬ ক্রোর টাকা এবং ইনকম ট্যাক্স ও সুপার ট্যাক্স বাবদ শুল্ক অপেক্ষাও অনেক বেশী টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকেন।"

এই Excise Duty বাবদ ভারতবর্ষের শিল্পগুলিকে বৎসরের পর পর বৎসর যে ক্ষতির ঝক্কি সহ্য করিতে হইতেছে নিম্নে তাহার নমুনা দেওয়া গেল।

ভারতবর্ষের কাপড়ের মিল হইতে সংগৃহীত
Excise Dutyর হিসাব

	১৯১৯	১৯২০
বোম্বাই	১১৬১৮০০০	১২৮৩৬০০০
মাদ্রাজ	৭৪৮০০০	৭৬৭০০৳

বঙ্গদেশ	২১০০০০	৩৩২০০০
যুক্তপ্রদেশ	৪৪০০০০	৬৩৩০০০
আজমীড়-মাড়োয়ার	৬৭০০০	৭৮০০০
পাঞ্জাব	২৩০০০	২৩০০০
দিল্লী	৩৩০০০	৪৪০০০
মধ্যপ্রদেশ এবং বেরার	৬৭৫০০০	৮৬৬০০০
করদ মিত্র ও অন্যান্য ভারতীয় স্বাধীন রাজ্য	৫০৭০০০	৮৯০০০০
মোট	১৫৩২১০০০	১৬৩৯৯০০০

মিলের দ্বারা বস্ত্র-সমস্যার সমাধান করিতে হইলে এই Excise Dutyর জের ভারতবর্ষকে হয়তো চিরদিনই টানিয়া চলিতে হইবে—হয়তো ইহার নাম এবং চেহারা তখন বদলাইয়া যাইবে। অর্থের অঙ্ক বদলাইয়া আরো ভারী হইয়া উঠাও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

অবশ্য ভারতবর্ষ যদি স্বাধীনতা লাভ করে তবে স্বতন্ত্র কথা। ট্যাক্সের বোঝা তখন আর কেহ তাহার ঘাড়ে চাপাইয়া দিতে পারিবে না। কিন্তু তাহা হইলেও এই প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষের জয়লাভ করিবার সম্ভাবনা যে খুব বেশী আছে তাহা নহে। কারণ ভারতবর্ষ কেবলমাত্র অর্থেরই কাঙ্গাল নহে। ইউরোপের ধনিক সভ্যতা যে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া আজ এত বড় হইয়াছে—সে সাধনাও ভারতবর্ষের নাই। ভারতবর্ষ কোনোদিনই গোটা দেশকে কারখানার শ্রমিক করিয়া গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করে নাই। সুতরাং পাশ্চাত্য জগতের শ্রমিকদের যোগ্যতা,

পারদর্শিতা, ক্ষিপ্রতা—এগুলির অভাবও ভারতবর্ষকে প্রতিপদে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করিবে। মিঃ রাশ্‌ব্রুক উইলিয়মস্‌ লিখিয়াছেন :—

"মিঃ টমাস্‌ এইনস্‌কাফ ভারতে ব্রিটিশ বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধীয় রিপোর্টে লিখিয়াছেন—ভারতীয় মজুরেরা ব্রিটিশ ও আমেরিকান মজুরদের তুলনায় কম মজুরী পায় বটে, কিন্তু কাজের দিক দিয়াও তাহারা অশিক্ষিত, অনিপুণ ও ঢিলা প্রকৃতির। মিঃ এইনস্‌কাফের এই মন্তব্য মিথ্যা নহে। * * * যে পর্য্যন্ত ভারতীয় মজুরদের জীবন-যাপনের ও কর্ম্ম-নৈপুণ্যের আদর্শ উচ্চতর না হইতেছে, সে পর্য্যন্ত তাহারা তাহাদের সমুদ্র-পারের প্রতিদ্বন্দ্বীদের মতো কাজে পারদর্শিতা দেখাইতে পারিবে না। এজন্য ভারতীয় মজুরদের মজুরী, বাসগৃহ, সাধারণ অবস্থা ঢের উন্নততর আদর্শের করিয়া তোলা দরকার। এ দেশের বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ এই উপায়েই কেবল পাকা বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।"

তাঁহার প্রদর্শিত পথে শ্রমিকদের যোগ্যতা বাড়ানো যেমন অর্থ-সাধ্য তেমনি সময়-সাধ্য ব্যাপার। সুতরাং সে পথ ভারতবর্ষের পক্ষে একরূপ নিষিদ্ধ পথ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহা ছাড়া শ্রমিক সমস্যা আজ ইউরোপে যেভাবে দেখা দিয়াছে—তাহা দেখিয়াও ওপথে পা-বাড়ানো হয়ত বিশেষ সঙ্গত হইবে না। ধনিক সভ্যতার জীর্ণ দেয়ালের উপর ভার আর কতখানি সহিবে সেটাও ভাবিয়া দেখিবার কথা। ইউরোপে নিজের ভারে আজ যাহা নিজেই ভাঙ্গিয়া পড়িবার মতো হইয়াছে তাহারই ভার ভারতবর্ষের ঘাড়ে চাপাইলে, সে তাহা সহ্য করিতে পারিবে কি না,

পাশ্চাত্য-সভ্যতার নীল চশ্‌মা চোখে না পরিয়া সাদা চোখেই তাহা যাচাই করিয়া লওয়া দরকার।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারার সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহারা জানেন, এই বস্ত্র-শিল্পে তাহার প্রতিষ্ঠা বড় সহজ ছিল না। গোটা তুনিয়ার বস্ত্রের অভাব একদিন তাহারই হাতে বোনা কাপড়ে পূর্ণ হইয়াছে। Mr. Shah ষোড়শ শতাব্দীর কোনো বিদেশী লেখকের লেখা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে :—

"'কেপ অব গুড্ হোপ' হইতে চীন পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানের প্রত্যেক অধিবাসী ভারতীয় তাঁতে তৈরী কাপড়েই তাহাদের দেহের আপাদমস্তক আচ্ছাদিত করিত।"

তুনিয়ার কাপড়ের যোগান দিতে গিয়া তাহাকে যখন কলের পায়ে তেল মাখিতে হয় নাই, তখন কেবলমাত্র তাহার নিজের দেশের বস্ত্র বোনার কাজ কল ছাড়া আজ তাহার চলিবে না কেন, তাহার কোনো সুস্পষ্ট যুক্তিই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—বিশেষতঃ যখন দেখা যাইতেছে, ভারতবর্ষের জমি, তাহার শ্রমিক, তাহার ব্যবসার ধারা, তাহার অর্থ-নৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সমস্তই কলের পরিপন্থী। কলের উপযোগী লম্বা আঁশের তুলা তাহার জমিতে জন্মায় না, কিন্তু তাহার জমিতে সে তুলা প্রচুর জন্মায় যাহার দ্বারা চরকায় সূতা কাটিলে দেশের অভাব তো মোটেই ঘোচে না, তাহা ছাড়া এমন বস্ত্রেরও রসদ পাওয়া যায় মিল যাহা কাটিবার কল্পনাও করিতে পারে না। বিদেশীর কষ্টিপাথরেও এ দেশের চরকার সূতার যে স্বরূপ ধরা পড়িয়াছে তাহারই একটু নমুনা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল :—

"বিশেষ জোরালো নজির উদ্ধৃত করিয়াই আমি দেখাইয়া দিতে পারি যে, এই সব সূতা গড়পড়তায় ৫০০ কাউণ্টের ছিল এবং ছোটো আঁশের তুলা হইতেই তাহা কাটা হইত। বর্ত্তমান যুগের বিশেষ উন্নতধরণের যন্ত্রেও অসাধারণ আয়াস ও পরিশ্রম ছাড়া এত বেশী নম্বরের সূতা কাটা যায় না!"—(Mr. Woogewerf in Quarterly Journal.)

যে হাতিয়ারে এই সূতা কাটা হইয়াছে তাহার কল-কব্জার জন্য বিদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই। তাহার উপাদান সামান্য কয়েকখানা কাঠ মাত্র। আর সে কাঠ ভারতের বনে-জঙ্গলে এত পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মায় যে, তাহার জন্য একটি টাকা ফেলিয়া দিলেই যথেষ্ট। এই হাতিয়ারে ভারতবর্ষ ইচ্ছা করিলে কেবলমাত্র তাহার নিজের নহে, দুনিয়ার আরো অনেক স্থানের বস্ত্র-শিল্পের অভাব পূর্ণ করিতে পারে। যে প্রচুর মূলধন মিলের পক্ষে অপরিহার্য্য এবং যাহার যোগান দিবার সাধ্য ভারতবর্ষের নাই, চরকায় সে মূলধনেরও আবশ্যক হয় না। মিলে যে প্রতিযোগিতার আশঙ্কা আছে, গৃহ-শিল্পের সাধারণ নিয়ম অনুসারে চরকা সে প্রতিযোগিতার হাত হইতেও মুক্ত। সুতরাং যুক্তির দিক দিয়াও যাচাই করিতে গেলে, ভারতবর্ষে অন্ততঃ মিলের উপর জোর দেওয়ার কোনো যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

তবে এ আশঙ্কা একেবারে অস্বাভাবিক নহে যে, যন্ত্র-শিল্পের রথ-চক্র-ঘর্ঘরে যেখানে দুনিয়ার অর্থ-ভাণ্ডার মাথা লুটাইয়া দিতেছে সেখানে গৃহ-শিল্পের প্রচেষ্টাকে জীয়াইয়া রাখা সম্ভবপর হইবে কি না। কিন্তু যাঁহারা দেখিতে জানেন তাঁহারা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছেন যে, যন্ত্র-শিল্প আপনার মৃত্যুবাণ আপনারই বুকে হানিয়া বসিয়া আছে। যে অবিচার

ও অন্যায়ের উপর যন্ত্র-শিল্পের বনিয়াদ গড়িয়া উঠিয়াছে, দুনিয়ার শ্রমিকদের কুঠার তাহার মূলে ঘা দিতে সুরু করিয়াছে। বর্ত্তমানের চাকচিক্যে তাহার ধ্বংসের নিশানাটা দেখা না গেলেও ভবিষ্যতের অন্তরালে তাহার ধ্বংসেরও খুব দেরী নাই। লক্ষ লোকের বুকের রক্ত পান করিয়া কাহারো গৌরব-ধ্বজা যখন রাঙা হইয়া উঠে, অকস্মাৎ একদিন তাহার মাথার মুকুট, যাহাদের রক্ত সে পান করিয়াছে তাহাদেরই পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়ে। আভিজাত্যের জয়-ধ্বজা একদিন দুনিয়ার দরবারে এমনি করিয়া মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু তাহার চূড়া যখন ভাঙ্গিয়া পড়িল তখন সাবধান হইবার অবসরটুকুও তাহার মিলে নাই।

ইউরোপ পাশ্চাত্য সভ্যতার মদে মশ্‌গুল হইয়া আছে। সুতরাং তাহার শিল্প-দেবতা যে মিলের ময়দানবের পায়ে মাথা লুটাইয়া মরিয়া গেল, আজও সে তাহা খেয়াল করিতে পারিতেছে না। কিন্তু ভারতবর্ষে মিলের জয়ের অভিযান এখনও সুরু হয় নাই। সুতরাং তাহার সাবধান হইবার সময় এখনও হয় তো মিলিতে পারে, এবং মনে হয় চরকার এই আকস্মিক আন্দোলনের ভিতর দিয়া সেই ইঙ্গিতটাই আজ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু এ সকল যুক্তির অপেক্ষাও সোজাসুজি যুক্তির কথা এই যে, খাদ্যের মতো যে জিনিসটা প্রয়োজনীয়, সম্ভব হইলে খাদ্যের মতোই তাহা ঘরে তৈরী করিয়া লইতে পারিলে ভালো হয়, অন্ততঃ তাহার জন্য ভিন্ন-দেশের মুখাপেক্ষী যাহাতে না হইতে হয়, তাহার পথটা সকলের আগে পরিষ্কার করিয়া রাখা দরকার। চরকায় সূতা কাটিলে নিজের ঘরেই হয় তো বস্ত্রের চাহিদা মিটানো চলে। কিন্তু মিলের শরণাপন্ন হইলে সে

সম্ভাবনা তো নাই-ই, কত জিনিষের জন্য যে সে ক্ষেত্রে পরের শরণাপন্ন হইতে হয় তাহারও ইয়ত্তা নাই। শেফিল্ড বা বার্ম্মিংহাম যদি বলে—আমি কল-কব্জা সরবরাহ করিব না, আমেরিকা যদি বলে—আমার কাছে লম্বা আঁশের তুলা পাওয়ার আশা মিথ্যা—আমি নিজে কাপড় বুনিয়া তোমাদের দেশে খরচার বিশগুণ বেশী দামে বিক্রী করিয়া লাভ করিব, ইংলণ্ড যদি বলে—আমার শিল্প-রক্ষার জন্য যখন প্রয়োজন তখন তোমার কলের পণ্যের উপর এমন শুল্ক বসাইব যে, পড়্‌তা পোষাইতে পারিবে না, তবে তাসের প্রাসাদের মতো মিলের দ্বারা দেশের বস্ত্র-শিল্পের পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা কোথায় যে মিলাইয়া যাইবে কেহ খুঁজিয়াও তাহার সন্ধান দিতে পারিবে না। এইজন্যই সংস্কৃত নীতি-শাস্ত্রে একটি কথা বার-বার করিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, "সর্ব্বং আত্মবশং সুখম্, সর্ব্বং পরবশং দুঃখম্।" অবশ্য দুনিয়ায় বাস করিতে গেলে একেবারে আত্ম-তৃপ্ত হইয়া থাকা যায় না, পরের উপর কতকটা নির্ভর করিতেই হয়। আর এই নির্ভরতা অপরিহার্য্য বলিয়াই মানুষের সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সমাজের ভিতরও পরস্পরের দেনা-পাওনার ঋণ যে কতদূর পর্য্যন্ত গড়ানো দরকার তাহা লইয়াও মতদ্বৈধের অন্ত নাই। অন্ততঃ এ কথাটায় কেহই সন্দেহ করে না যে, নিতান্ত প্রয়োজনের জিনিষগুলির জন্য পরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকার মতো নির্ব্বুদ্ধিতা আর নাই।

মস্‌লিনের কথা

মস্‌লিনের নাম আমরা সকলেই জানি এবং এই বাংলাতেই তাহা চরমতম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল বলিয়া মনে গর্ব্বও অনুভব করি। অথচ এই মস্‌লিনকে প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ আজ পর্য্যন্ত খুব কম বাঙ্গালীর ভাগ্যেই ঘটিয়াছে! 'খাদি-প্রতিষ্ঠান' বহু কষ্টে একখণ্ড মস্‌লিন সংগ্রহ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহাও সর্ব্বোৎকৃষ্ট মস্‌লিনের নমুনা নহে। তাহা অপেক্ষাও বহুগুণে শ্রেষ্ঠ মস্‌লিন এই বাংলার ঢাকা সহরেই প্রস্তুত হইত। দুই একটি যাদুঘর ছাড়া বর্ত্তমানে এই সমস্ত মস্‌লিন চোখে দেখিবারও আর উপায় নাই। বিদেশী বণিকদের অত্যাচারে এ দেশের এত বড় শিল্পটা এমনি ভাবেই ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়াছে!

মস্‌লিনের সঙ্গে আজ চাক্ষুস পরিচয়ের উপায় অন্তর্হিত হইয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া মস্‌লিনের শ্রেষ্ঠত্বের সাক্ষ্যেরও যে অভাব হইয়াছে তাহা নহে। ইতিহাসের পাতায় অন্বেষণ করিলে বহু স্থানে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এ সাক্ষ্য অবশ্য ভারতবাসীরা নিজেরা দেয় নাই। এই আত্ম-ভোলা জাতি নিজেদের কৃতিত্ব বা গৌরব সম্বন্ধে এমনই নির্ব্বিকার ছিল যে, গৌরবের ইতিহাস লিখিবার প্রয়োজন আছে বলিয়াও তাহারা মনে করিত না। তাই ভারতবর্ষের ইতিহাস বিদেশীদের পুঁথি-পত্র ঘাঁটিয়াই বাহির করিতে হয়। মস্‌লিনের ইতিহাসও এই জন্যই ভারতীয় গ্রন্থাবলী হইতে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না—তাহার জন্য খুঁজিতে হয়

বৈদেশিক পরিব্রাজকদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত ও বিদেশী ঐতিহাসিকদের পুঁথি-পত্র। প্রাচীন বা আধুনিক এ উভয় যুগের কোনো লেখকের ভিতরেই মসলিনের সম্বন্ধে আলোচনায় বিশেষ মতদ্বৈধ হইতে দেখা যায় না। তাঁহারা সকলেই উচ্ছ্বসিত ভাষায় মসলিনের জয়গান রচনা করিয়া গিয়াছেন। নিম্নে এ সম্বন্ধে কয়েকটি মত উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

টেভারনিয়ার নিজে তুল ও শিল্প দ্রব্য সমূহের জহুরী ছিলেন এবং এই শিল্পের ব্যবসাতেই তিনি দীর্ঘ দিন যাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"কতকগুলি 'কালিকাট' (কালিকাট হইতে ভারতীয় বস্ত্র ইউরোপে চালান হইত বলিয়া ইউরোপীয়েরা ভারতীয় বস্ত্রকে সাধারণতঃ 'কালিকো' বা 'কালিকাট' নামে অভিহিত করিতেন) এতই সূক্ষ্ম যে তাহা হাতে অনুভব করাও কঠিন হয় এবং তাহার সূতা সহজে চোখেও ধরা পড়ে না।" (Travels, vol, I. 811) তিনিই অন্যত্র আবার লিখিয়াছেন,—"মানুষ যখন ইহা পরিধান করে তখন দেহের ত্বক স্পষ্ট ভাবে দেখা যায়—মনে হয় সে যেন নগ্ন দেহেই অবস্থান করিতেছে।" (Op. cit. Vol. II, 4) মসলিন সম্বন্ধে বেইনস্ বলেন—"ইহাকে মানুষের হাতের কাজ বলিয়া মনে হয় না, মনে হয় কোনো পরী অথবা কোনো কীট-পতঙ্গ ইহা প্রস্তুত করিয়া গিয়াছে।" (Baines, The Histoy of Cotton Manufactures [1845] p. 56) "মসলিপত্তনে যেরূপ উৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত হয় পৃথিবীর আর কোনও অংশে সেরূপ বস্ত্র তৈরী হয় না।" (Travels from Marcopolo, Book III)

মসলিনের সূক্ষ্মত্ব সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত গল্পও এই সব বৈদেশিক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে দুইটি গল্পের উল্লেখ করিতেছি। প্রথম

গল্পটি ঔরঙ্গজেবের সম্পর্কে। ঔরঙ্গজেব তাঁহার কন্যাকে বস্ত্রের ভিতর দিয়া দেহের ত্বক দেখিতে পাওয়ার অপরাধে একবার তিরস্কার করেন। তিরস্কৃত হইয়া সম্রাটজাদী বাদশাহকে বলিয়াছিলেন—"জাঁহাপনা, আপনি আমাকে অনর্থক তিরস্কার করিতেছেন, আমার দেহে সাতটি জামার আচ্ছাদন রহিয়াছে।" যে বস্ত্রের তৈরী সাতটি জামার আচ্ছাদনেও দেহের বর্ণ ঢাকা পড়ে না, সে বস্ত্রের সূক্ষ্মত্ব যে কিরূপ তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। দ্বিতীয় গল্পটি আলিবর্দ্দি খাঁর সম্পর্কে। একবার একজন তাঁতি একখানা 'আবরোঁয়া' (মস্‌লিন) ঘাসের উপরে ফেলিয়া রাখে। ফলে লূতা-তন্তুর ন্যায় সেই বস্ত্রখানি ঘাসের সঙ্গে এমন ভাবেই মিশিয়া যায় যে, তাহার একটি গাভী ঘাস মনে করিয়াই ঘাসের সঙ্গে 'আবরোঁয়া' খানিও চিবাইয়া খাইয়া ফেলে। একখণ্ড মস্‌লিনকে এইরূপে নষ্ট করার জন্য আলিবর্দ্দি খাঁ তাঁতিটিকে দণ্ড প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাহাকে ঢাকা সহর হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। (Bolts' Considerations on the affairs of India, P. 206. From Cotton Manufactures of India, pp. 44-45) শেষোক্ত ঘটনাটি হইতে মস্‌লিনের সূক্ষ্মত্বের পরিচয় তো পাওয়া যায়ই, শাসন-কর্ত্তারা তাহা যে কিরূপ মূল্যবান মনে করিতেন, এবং তাহার শুভাশুভ সম্বন্ধে যে কতটা সচেতন ছিলেন তাহারও পরিচয় পাওয়া যায়।

ঢাকা-মস্‌লিনকে নানা বিচিত্র নামে ভূষিত করা হইয়াছে। এই সব নামও ইহার সূক্ষ্মত্ব, সৌন্দর্য্য এবং উৎকর্ষের পরিচয় প্রদান করে। ইহার একটি নাম 'সাবনাম' আর্থাৎ সান্ধ্য-শিশির। বালিতে বিস্তৃত মস্‌লিনের উপর শিশিরবিন্দু পড়িলে উহার অস্তিত্ব আর অনুভূত হয় না—এই জন্যই

মস্‌লিনকে এই নামটি দেওয়া হইয়াছিল। ঢাকা-মস্‌লিনের আর একটি নাম 'আবরোঁয়া—অর্থাৎ জল-প্রবাহ। ইহার এ নামের কারণ, জলের স্রোতে ছাড়িয়া দিলে মস্‌লিনের সূতা আর চোখে পড়ে না, তাহাকে জলের স্রোতের মতই দেখায়। 'তান্‌জেব' (দেহের অলঙ্কার), 'আলাবল্লি, (অতি সূক্ষ্ম) 'খাস' (সুকুমার) প্রভৃতি নামও মস্‌লিনের সহিত সংযুক্ত দেখা যায়। এই সমস্ত কবিত্বময় নামের দ্বারা বোঝা যায়, মস্‌লিনের সৌন্দর্য্য কি অপরূপ ছিল এবং ইহা লোকের হৃদয়কেও কিরূপ ভাবে জয় করিয়াছিল।

ভারতবর্ষের বস্ত্র-শিল্পকে ধ্বংস করিবার জন্য খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইউরোপে, বিশেষ ভাবে ইংলণ্ডে একটা প্রবল চেষ্টা জাগিয়া উঠিয়াছিল। এই সময় মস্‌লিনকে আক্রমণ করিয়া বহু পুস্তিকাও প্রকাশিত হয়। এই সব পুস্তিকা যাহা মস্‌লিনের বিরুদ্ধে আন্দোলন জাগাইয়া তুলিবার জন্য রচিত হইয়াছিল তাহাও মস্‌লিনের অপার্থিব সৌন্দর্য্যকে অস্বীকার করিতে পারে নাই। এই সমস্ত রচনায় মস্‌লিনের যে সব নাম ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার ভিতর দিয়াও ইহার শ্রী, সৌষ্ঠব, শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রতিষ্ঠার পরিচয় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কেহ ইহার নাম দিয়াছিলেন Textile Breeze (বাতাসের বস্ত্র), কেহ নাম দিয়াছিলেন Web of woven air (বাতাসে বুনো জাল), কেহ বা ইহাকে অভিহিত করিয়াছেন Cobweb (লূতা-তন্তু) নামে, আবার কাহারও অভিধানে বা ইহা Shadow of a Commodity (বস্তু নহে বস্তুর ছায়া) নাম লাভ করিয়াছে।

মস্‌লিনের গুণ-বিচারের জন্য যে সব উপায় ব্যবহৃত হইত তাহাও ইহার অসাধারণ সূক্ষ্মত্ব ও শিল্প-সৌন্দর্য্যেরই পরিচায়ক। একটি উপায় ছিল—

ক্ষুদ্র একটি আংটির ভিতর দিয়া ২০ গজ পরিমাণ দীর্ঘ একখণ্ড মস্‌লিন এ-ধার হইতে ও-ধারে বাহির করিয়া লওয়া। আর একটি উপায় ছিল—ইহার ওজন, ১৫ গজ দীর্ঘ এবং এক গজ বহরের ভাল একখণ্ড মস্‌লিন ওজনে ১ পাউণ্ডের দশ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ চারি তোলার বেশী হইত না। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে পারস্যের একজন রাজদূত ভারতবর্ষ হইতে ফিরিবার সময় তাঁহার সম্রাটের জন্য ৩০ গজ লম্বা মস্‌লিনের একটি শিরোভূষণ লইয়া যান। এই শিরোভূষণটি তিনি তাঁহার মনিবকে একটি মণি-মাণিক্যে খচিত নারিকেলের খোলের ভিতর ভরিয়া উপহার দিয়াছিলেন।

মিলের প্রতিষ্ঠার পর ভারতীয় মস্‌লিনের শ্রেষ্ঠত্বকে খর্ব্ব করিবার জন্য বহু প্রকারের চেষ্টা চলে। মিলেও মস্‌লিন প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয়। মিলের মালিকেরা প্রচার করিতে থাকেন যে, তাঁহাদের কলের মস্‌লিন ভারতীয় মস্‌লিন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে এবং ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে দুইটি প্রদর্শনীতেও ফরাসী দেশের, ইংলণ্ডের এবং ভারতের মস্‌লিন পাশাপাশি রাখিয়া দেখাইবার ব্যবস্থা করা হয়। এই তিন দেশের মস্‌লিন লইয়াই বিশেষজ্ঞেরা নানা ভাবে বিচার করিয়াছিলেন। বিচারের পদ্ধতি সুদীর্ঘ ও অতিমাত্রায় বৈজ্ঞানিক। Mr. Forbes Watson-এর "The Textile Manufactures and the Costumes of the People of India" নামক গ্রন্থে এই বিচার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচিত হইয়াছে। বিস্তৃত বিবরণ না দিয়া Mr. Watson যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহাই এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। তিনি লিখিয়াছেন,"—যেদিক দিক দিয়াই বিচার করিয়া দেখা যায় না কেন, আমাদের পণ্যের আরও অনেক

উন্নতি করা দরকার। আমাদের কলকব্জা এবং অদ্ভুত যন্ত্রপাতির সাহায্যেও আমরা ঢাকাই মস্‌লিনের (woven air) অনুরূপ বস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারি নাই। সূক্ষ্মত্ব এবং ব্যবহারিক যোগ্যতা—যেদিক দিয়াই যাচাই করা যায়, আমাদের মসলিন ঢাকাই মসলিনের চের নিম্নস্তরের। ঢাকাই মসলিন প্রস্তুতের যন্ত্রপাতি শ্রীহীন ও আদিম যুগের বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এ বস্ত্র তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে অদ্ভুত রকমের উপযোগী। (The Textile Manufactues etc, p, 64)

এই একান্ত সাধারণ রকমের যন্ত্রপাতির সাহায্যে অসাধারণ মস্‌লিন প্রস্তুত হইতে দেখিয়া মিঃ বেইনস্‌ও লিখিয়াছেন—"ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া মনে হয় যে, যেখানে কাঁচামাল অতিমাত্রায় অনাদৃত, যেখানে শ্রম বিভাগের ব্যবস্থা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, যেখানে যন্ত্রপাতি অতি সাধারণ রকমের সেখানেও এরূপ বস্ত্র তৈরী হইয়াছে যাহার সৌন্দর্য্য এবং সূক্ষ্মত্ব অতুলনীয়, বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠতম কলকব্জায় অভিজ্ঞ অতি নিপুণ কারিকরের শিল্প-নৈপুণ্যও যাহার কাছে দাঁড়াইতে পারে না।"

আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার ধ্বংস করার জন্য ইউরোপের লোকেরা আরবদের নামের সঙ্গে বর্ব্বরতার একটা ছাপ আঁটিয়া দিয়াছিল। কিন্তু যে বর্ব্বরতার দ্বারা ভারতবর্ষের বস্ত্র-শিল্প ইউরোপীয় বণিকেরা ধ্বংস করিয়াছেন তাহার সঙ্গে আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার যাহারা ধ্বংস করিয়াছিল তাহাদের বর্ব্বরতার তুলনাই হয় না। একদিনে নহে, উত্তেজনার মাথায় নহে, দিনের পর দিন, অত্যাচারের নূতন নূতন পন্থা আবিষ্কার করিয়া এ দেশের বস্ত্র শিল্পকে ধ্বংস করা হয়। যাহা শিল্প-দেবতার প্রসন্ন দৃষ্টিপাতে জগতের শ্রেষ্ঠতম গৌরব লাভ করে, কোনো সভ্য দেশই তাহাকে পূজার

অর্থ্য হইতে বঞ্চিত করে না; ক্ষতির হাত হইতে, অত্যাচারের হাত হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়াই সমস্ত জাতি সভ্যতার সম্মান লাভ করে। কিন্তু মস্‌লিন সমগ্র পৃথিবীর দুর্লভতম সম্পদ জানিয়াও অর্থগৃধ্নু বিদেশী বণিকেরা তাহা ধ্বংস করিয়াছিল। আজ যখন আবার বস্ত্র-শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তোলার চেষ্টা চলিতেছে তখন এই ধ্বংসের ইতিহাসটাও জানিয়া রাখা দরকার। পরবর্ত্তী প্রবন্ধে আমরা সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি।

ইংরেজের স্বদেশী আন্দোলন

যে সব ব্যবস্থার দ্বারা ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পের ধ্বংস সাধিত হইয়াছে তাহার আলোচনা করিবার পূর্ব্বে বিদেশে ভারতীয় বস্ত্র যে কতটা প্রসার লাভ করিয়াছিল তাহারই পরিচয় প্রদান করা দরকার। ভারতীয় বস্ত্রের চাহিদা যখন ইংলণ্ডের বাজারকে প্লাবিত করিয়া ফেলিয়াছিল তখন সেখানে ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পের বিরুদ্ধে একটা প্রকাণ্ড আন্দোলন জাগিয়া উঠে। পার্লিয়ামেণ্টে, সাধারণ জন-সভায়, প্রবন্ধে, পুস্তিকায়, ছড়ায়, গানে ভারতীয় বস্ত্রের উপর আক্রমণ চলিতে থাকে। এ আন্দোলনের চিত্র তখনকার সাহিত্যের ভিতর দিয়াই অমর হইয়া আছে। এই আক্রমণ-গুলির ভিতর দিয়া ইংরেজদের স্বদেশ প্রেমের ছবি যেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে, তেমনি ভারতীয় বস্ত্রের প্রসার ও প্রাধান্যের ছবিও ফুটিয়া উঠিয়াছে। নিম্নে কতকগুলি আক্রমণের নমুনা ভাষান্তরিত করিয়া দেওয়া গেল :—

"ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কেম্পানীর কল্যাণে এ দেশের কাটুনী, তাঁতি, রংরাজদের কারবার ভারতবর্ষের হাতে গিয়া পড়িয়াছে! সেখানে তাঁহারা ভারত-বাসীদিগকে কেবলমাত্র শিল্প প্রস্তুত সম্বন্ধেই উপদেশ দিতেছেন না, ইংলণ্ডে রঙ্গিন এবং তৈরী করা বস্ত্রও প্রেরণ করিতেছেন। ফলে এ-দেশের শ্রমিকদের দারিদ্র্য অসম্ভব রকমে বাড়িয়া গিয়াছে। এই ব্যবস্থা বহু সহস্র পরিবারেরও ধ্বংসের কারণ হইয়াছে।"—(Allegations of the Turkey Company.)

"আগাছা যেমন দ্রুত গতিতে বাড়িয়া উঠে ভারতবর্ষের এই শিল্পটি তেমনি ভাবে বাড়িয়া উঠিয়াছে। ফ্যাসানের যাঁহারা রাজা তাঁহারা হইতে সামান্ত রাঁধুনী রমণীরা পর্য্যন্ত কেহই ভারতীয় বস্ত্র ছাড়া আর কোনো বস্ত্রকে দেহাচ্ছাদনের যোগ্য বলিয়া মনে করে না। ভারতের স্ক্রিণ, বিছানার চাদর, পর্দ্দা ছাড়া অন্ত কোনো জিনিষ গৃহ-সজ্জার জন্তও আর পছন্দ হয় না।"—(Board of Trade-এর কাছে Pollexfen-এর বক্তৃতা।)

"ফরাসী দেশের ফ্যাসন-মাফিক পরিচ্ছদ প্রভৃতি আমাদের গভীর দুঃখের কারণ হইয়াছে। তাহার উপর ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীও ঐ ধরণের অজস্র পণ্য আমদানী করিতেছেন। ফলে আমাদের দর্জ্জিরা বিশেষ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে।"—(English Winding sheet for East India Manufactors.)

"বহু দরিদ্র শিল্প-ব্যবসায়ী 'কালিকো'র আমদানীর জন্ত কাজ যোটাইতে পারে না। এইরূপে জীবিকার্জ্জনের উপায় হইতে বঞ্চিত হওয়ায় রাস্তায় এবং মাঠে তাহাদের অনেককে মৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। আমাদের অসংখ্য লোক আজ ভীষণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত।" (A Second Humble Petition to the Rt. Hon'ble the House of Commons.)

"ফ্যাসান যে যাদুকরী, তাহাতে ভুল নাই। পণ্য যতই দুর্ম্মূল্য ও দুর্লভ হয় তাহার চাহিদাও ততই বেশী হয়। ত্রিশ শিলিং দামে এক গজ মস্‌লিন বিকায়। অথচ এ জিনিষটাকে বস্ত্র না বলিয়া বস্ত্রের ছায়াও বলা চলে।"—(Naked Truth—1696.)

"এই ব্যবসাটির চেয়ে খারাপ ব্যবসা আর কিছুই হইতে পারে না। কারণ যে স্বর্ণ এবং রৌপ্য আমরা দিতে পারি না, তাহাও ইহা আমাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিতেছে এবং বিনিময়ে আমাদিগকে খেলনা এবং হস্ত-নির্ম্মিত সেই সব পণ্যই দান করিতেছে যাহার প্রয়োজন আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা কম।"—(England and India Inconsistent in their manufactures)

১৬৮০ খৃষ্টাব্দে এই সম্পর্কে পার্লিয়ামেণ্টে একটি বিতর্ক উপস্থিত হয়। এই বিতর্কের কয়েকটি মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল ঃ—

"ভারতবাসীরা দৈনিক এক পেনির জন্য কাজ করে। কাঁচা মালও তাহারা অল্প দামে পায়। তাহাদের এই ব্যবসা কালে কি আকার ধারণ করিবে তাহার হিসাব নিকাশ করা দূরের কথা, তাহা ভাবিতেও আমাদের হৃদকম্প উপস্থিত হয়। এ সিদ্ধান্ত আমরা অনায়াসেই করিতে পারি যে, এই শিল্পের দ্বারা ভারতীয় লোকেরা কাজ পাইবে এবং সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিবে এবং আমাদের লোকেরা নিঃস্ব হইয়া পড়িবে।"

"ইহাকে যদি বাধা না দেওয়া যায় তবে ইহা আমাদের বেশীর ভাগ শিল্পকেই নষ্ট করিবে।"

"যদি (ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে) এইরূপ আরও তিনটি অধিকার (Charter) দেওয়া হয় তবে জীবিকার্জ্জনের জন্য জাতির অধিকাংশ লোক কোন পথ গ্রহণ করিবে? এই কোম্পানীর দ্বারা বহু সহস্র ইংরেজের জন্মগত অধিকারকে অবহেলা করা হইয়াছে। সুতরাং ইহার সম্বন্ধে পুনরায় ভাবে চিন্তা করা আবশ্যক।"

"কেবলমাত্র রেশম-বয়নকারীদের ব্যবসা নহে, জাতির অধিকাংশ ব্যবসাই ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক আনীত পণ্যের ব্যবহারের দ্বারা বিপন্ন হইয়াছে।"

"বাংলার ছাপ দেওয়া এবং চিত্রিত 'কালিকো' এবং অন্যান্য বস্ত্র বিছানায়, ঘরের পর্দায় এবং সর্ব্বপ্রকার পোষাক-পরিচ্ছদের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে।"

১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে বিলাতে 'কালিকো'র আমদানীর পরিমাণ ছিল ১৫০ হইতে ১৬০ হাজার পাউণ্ড। এই বৎসরেই কর্ণেল বার্চ্চ পার্লিয়ামেন্টে ভারতীয় বস্ত্রের আমদানী সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া বলেন—"একটি পণ্য আমাদিগকে বিশেষ ভাবে ধ্বংস করিতেছে—সে পণ্যটি 'কালিকো'। এই 'কালিকোর' দ্বারাই আমাদের পশমী বস্ত্রের শিল্প বিশেষ ভাবে ধ্বংস হইতে বসিয়াছে। ইহার দ্বারা আপনারা সেই সব নাস্তিকদের সঙ্গে ব্যবসায় রত হইয়াছেন, যাহারা দৈনিক এক পেনির জন্য কাজ করে এবং খৃষ্টানদিগকে ধ্বংস করে। আপনারা বৎসরে ১ লক্ষ ৮০ হাজার পাউণ্ড রান্না ঘরের রমণীদের জন্য ব্যয় করেন। কারণ তাহারা মস্তকাবরণ ও গাত্রাচ্ছাদনের জন্য সেই সব উজ্জ্বল রেশমের বস্ত্রই ব্যবহার করে যাহা সমুদ্রের অপর পার হইতে প্রস্তুত হইয়া আসে।"

দেশের নানা স্থান হইতে 'হাউস-অব-কমন্সে' অভিযোগ-পত্র আসিতে থাকে। তাহার একখানাতে লেখা ছিল—"বস্ত্র-বয়ন এবং তাহার আনুষঙ্গিক অন্যান্য ব্যবসা আমাদের ভিতর হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। এই ব্যবসাই পূর্ব্বে দরিদ্রদের ভরণ-পোষণ এবং তাহাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহের প্রধান উপায় ছিল। ছাপানো রেশমী বস্ত্র, বাংলার

বস্ত্র এবং ভারতবর্ষের ও পারস্য দেশের চিত্রিত 'কালিকো'ই এই সব ব্যবসার ধ্বংসের প্রধান কারণ।"

"(ভারতীয় রেশম বস্ত্র আমদানীর) ফল এই হইয়াছে যে, মিলের মালিকেরা ধ্বংস হইয়াছে, ব্যবসা না থাকায় কারিকরেরা পলায়ন করিয়াছে। * * * * কেহ কেহ স্বগৃহে পত্নী-পুত্র সহ অনশনে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। জন-সাধারণ পল্লী অঞ্চলে ফিরিয়া গিয়াছে, গৃহ সকল শূন্য এবং কারাগার সমূহ পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।"—England's Danger by Indian Manufactures.

"ভারতীয় পণ্য সাধারণের চিত্তকে এমন ভাবেই আকর্ষণ করিয়াছে যে, যে সমস্ত ছিট ও রঙ্গিন বস্ত্র পূর্ব্বে কার্পেট, লেপ এবং ছেলেদের ও ইতর জন-সাধারণের পরিচ্ছদ রূপে ব্যবহৃত হইত এখন তাহাই মহিলাদের পরিচ্ছদ রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। পূর্ব্বে যাহা দাসী-বাঁদীরাও পরিতে দ্বিধা করিত এখন তাহাই বিশিষ্ট ভদ্রলোকের পোষাকে পরিণত হইয়াছে। ছিটগুলি ঘরের মেজে হইতে মানুষের দেহে উঠিয়াছে, পা মুছিবার ন্যাকড়া হইতে 'পেটিকোটে' আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এমন কি রাণী পর্য্যন্ত চীনাংশুক এবং ভারতীয় বস্ত্রে সজ্জিত হইতেই আনন্দ অনুভব করেন। কেবলমাত্র ইহাই নহে—ভারতীয় বস্ত্র-পণ্য আমাদের গৃহে, আমাদের বৈঠকখানায়, আমাদের শয্যাগারে প্রবেশ করিয়াছে। মশারী, কুশান, চেয়ার, এমন কি শয্যার উপাদানগুলিও এই ভারতীয় বস্ত্রে প্রস্তুত। সংক্ষেপে নারীর পোষাক, বা গৃহের আসবাব-পত্র যাহা কিছু রেশম বা পশমে তৈরী হইত, সমস্তই ভারতীয় বাণিজ্য-সম্ভার হইতে সরবরাহ হইতেছে।"—Daniel Defoe.

এই ডেনিয়েল ডেফোর লেখাতেই পাওয়া যায় যে, ভারতীয় বস্ত্রের আমদানী বন্ধ করিবার জন্য ইংলণ্ডের কারিকরেরা দাঙ্গা করিতেও ইতস্ততঃ করে নাই, প্রকাশ্য রাজপথে তাহারা ভারতীয় বস্ত্রের পরিচ্ছদে সজ্জিতা রমণীকেও অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিয়াছে।

দেশের লোককে স্বদেশী ভাবে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য বহু ছড়া ও গানেরও সৃষ্টি হইয়াছিল; এখানে এইরূপ দুইটি ছড়ার অনুবাদ দেওয়া গেল :—

"তাঁত এবং কেরকী এবং চরকা আদি যন্ত্র,—
ঘরের লক্ষ্মী ঘরে রাখার ওরাই পরম মন্ত্র।
দেশের রেশম পশম যদি নিত্য পরো অঙ্গে,
গরীব বাঁচে,—বিত্ত দেশের বাঁচে তারই সঙ্গে।"

(England's Almanac.)

"ভারতবর্ষের পণ্য যখন ইংরেজেরাই যাচে,
ব্যবসা তাহার তখন বা আর কিসের জোরেই বাঁচে ?
ব্যবসা এবং অর্থ যখন ভারত লুটে' নেয়,
রাজার খাজনা প্রজা তখন কোত্থেকেই বা দেয় ?
খাজনা দিবে কোত্থেকে গো—বাঁচ্‌বে কিসে প্রজা,
চাকরী খুঁজে পায় সে যদি ব্যর্থতারই বোঝা !
পণ্য যাহা জাহাজ বোঝাই এদেশে পৌছায়—
এর আগেতে সে সব জিনিষ কেউ দেখেছে হায় !"

(England's Almanac.)

সে দিনের ভারতীয় বস্ত্র-শিল্প ইংলণ্ডের একটা প্রধান শিল্পকে ধ্বংস করিতে বসিয়াছিলে। সুতরাং তখনকার ইংরেজের মনোভাব যে ইহার বিরুদ্ধে এই আকার ধারণ করিবে তাহাতে বিস্মিত হওয়ার কারণ নাই—তাহা অস্বাভাবিকও নহে। আজ ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য যাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারাও এই একই কথা বলেন। তাঁহারা বলেন যে, বিদেশী বস্ত্র-শিল্পের দ্বারা ভারতবর্ষে যে শোষণ চলিতেছে তাহা দেশকে দরিদ্র, নিরন্ন, নিত্য-দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ও মৃত্যু-পথাশ্রয়ী করিয়া তুলিতেছে। সুতরাং বিদেশী বস্ত্রকে অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়া আজ ভারত-বাসীর দেশী বস্ত্রের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়া দরকার। ইংরেজকে কিন্তু আজ একথা আর স্বীকার করিতে দেখা যায় না। তাই এ দেশের জীবন-রসদ শোষণ করিয়াই তাঁহাদের বস্ত্রের ব্যবসা চলিতেছে। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে ইংরেজরাই ভারতবর্ষ হইতে বস্ত্র রপ্তানী করিয়া ব্যবসার গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন, লাভবান যাঁহারা হইয়াছেন তাঁহারাও ভারতবাসী নহেন—ইংরেজ, তথাপি এই ব্যবসার বিরুদ্ধে যে এত বড় তীব্র আন্দোলন জাগিয়া উঠিয়াছিল তাহার কারণ, ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসা জাতির একটা প্রধান অবলম্বনকে নষ্ট করিয়াছিল। ভারতবর্ষে প্রায় প্রত্যেক ঘরেই চরকা চলিত। বিদেশী বস্ত্রের দ্বারা দেশের লোকের জীবিকার্জ্জনের এত বড় একটা শিল্প নষ্ট হইয়াছে। সুতরাং ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলন আরও তীব্রতর হওয়া দরকার। কিন্তু তাহা হয় নাই। ইংরেজদের আন্দোলন অপেক্ষা আমাদের আন্দোলন অনেক শান্ত। এই শান্ত আন্দোলনও ইংরেজকে কিন্তু ঢের অশান্ত করিয়া তুলিয়াছে। ফলে বিদেশী বর্জ্জনের চেষ্টাকে অঙ্কুরেই নষ্ট করিবার জন্য আজ নানা রকমের

অন্যায় অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায়। সুতরাং ইংলণ্ডে ভারতীয় বস্ত্র-বর্জ্জনের আন্দোলন কি ভাবে পরিচালিত হইয়াছিল এই সময়ে ইংরেজরা তাহা স্মরণ করিয়া রাখিলে উপকৃত হইবেন। ভারতবাসীদেরও তাহা জানিয়া রাখা দরকার। সে আন্দোলন যে কিরূপ গভীর—কিরূপ জোরালো ছিল তাহার পরিচয় উদ্ধৃত বাক্যগুলির ভিতর দিয়াই পাওয়া যায়। এই সমস্ত আন্দোলনের ফলে ব্রিটিশ-পার্লিয়ামেণ্টের ভিতর দিয়া যে সব ব্যবস্থা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল পরের প্রবন্ধে আমরা তাহারই পরিচয় দিতেছি।

বস্ত্র-শিল্পে ইংরেজের সংরক্ষণ নীতি

স্বাধীন দেশের প্রজাদের আন্দোলন এবং পরাধীন দেশের প্রজাদের আন্দোলনের ভিতর অনেক তফাৎ। তাই ভারতবর্ষের দারুণ দুর্দ্দশার বিরুদ্ধে আমাদের যে আন্দোলন আজ কর্ত্তৃপক্ষের কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙ্গিতে পারিতেছে না, ইংলণ্ডে সেই আন্দোলন কর্ত্তৃপক্ষকে অতিমাত্রায় সতর্ক করিয়া তুলিয়াছিল। নূতন নূতন আইন পাশ করিয়া তাঁহারা ইংলণ্ডে ভারতবর্ষের পণ্য-প্রবেশের পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে যে সমস্ত আইন পাশ হইয়াছিল নিম্নে তাহারই যৎসামান্য পরিচয় প্রদান করিতেছি ঃ—

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইংলণ্ডে যে সমস্ত পণ্য আমদানী করা হইত তাহার সবগুলির উপরেই শতকরা পাঁচ টাকা হিসাবে একটি শুল্ক নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই শুল্কের নাম ছিল Old Subsidy (পুরাতন শুল্ক)। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে মসলিন ও কার্পাস বস্ত্রের উপর একটি নূতন শুল্ক বসানো হয়। তাহার পরিমাণ শতকরা আড়াই টাকা। শুল্কের চাপে ফেলিয়া ভারতীয় বস্ত্রকে নিষ্পেষিত করিবার চেষ্টার সেই প্রথম গোড়া-পত্তন। ইহার ফলে একখানি ভারতীয় বস্ত্রের উপর ৯ পেন্স হইতে ৩ শিলিং, অর্থাৎ নয় আনা হইতে ২।০ টাকা পরিমাণ শুল্ক আদায়ের ব্যবস্থা কায়েম হইয়া যায়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ভারতীয় বস্ত্রের আমদানী না কমিয়া বাড়িয়াই

উঠে। ইহাতে বিস্মিত হইবার হেতু নাই। কারণ এতই সস্তায় এ দেশে বস্ত্র প্রস্তুত হইত যে, ইহা অপেক্ষা ঢের বেশী চাপে পড়িয়াও ভারতীয় বস্ত্রের আমদানী বিলাতে বন্ধ হয় নাই। সেই পরিচয়ই এখন প্রদান করিতেছি।

বস্তুতঃ এই ব্যবস্থার দ্বারা প্রতিকার না হওয়ায় আন্দোলন আরও তীব্র হইয়া দেখা দেয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—স্বাধীন দেশ, তাহাদের আন্দোলনের মূল্যও স্বতন্ত্র। তাই আবার ভারতীয় শিল্পের ধ্বংসের জন্য নূতন নূতন আইন পাশ হইতে থাকে। ১৬৮৫ সালে কালিকো, রেশম এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার বস্ত্রের উপর শতকরা দশ টাকা হিসাবে শুল্কের হার বাড়াইয়া দেওয়া হয় অর্থাৎ এইবার ভারতীয় পণ্যের শুল্ক আসিয়া দাঁড়ায় শতকরা ১৭॥০ টাকায়। ইহার পর হইতে শুল্কের মাত্রা ক্রমাগতই বাড়িতে থাকে। ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে আবার ১০ টাকা বাড়াইয়া তাহা ২৭॥০ টাকায় পরিণত করা হয়। ভারতীয় 'কালিকো এবং অন্যান্য কার্পাস বস্ত্র এবং সর্ব্বপ্রকার ছাপের কাজ করা বস্ত্র ও কেবল নীল ছাড়া ভারতবর্ষে অন্যান্য সমস্ত পণ্যের উপরেই এই শুল্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।' এই যে শতকরা ২০৲ টাকার বর্দ্ধিত শুল্ক ইহাই পরে Old Impost অর্থাৎ পুরাতন শুল্ক নামে অভিহিত হইয়াছিল। ১৬৯২—৯৩ খৃষ্টাব্দে শুল্কের অন্তর্ভুক্ত পণ্য সমূহের উপর আরও ৫৲ টাকা যোগ করা হয় এবং এই ভাবে ভারতীয় পণ্যের উপর শুল্কের পরিমাণ আসিয়া শতকরা ৩২॥০ টাকায় পৌছায়। ১৬৯৭—৯৮ খৃষ্টাব্দে এই ৩২॥০ টাকার সঙ্গে আরও পাঁচ টাকা যোগ করা হয়। এইবার মোট শুল্কের পরিমাণ আসিয়া দাঁড়ায় ৩৭॥০ টাকাতে। শেষোক্ত পাচ টাকার এই শুল্কটির নাম দেওয়া

হয় New Subsidy অর্থাৎ নূতন শুল্ক। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে এইরূপে ভারতীয় পণ্যের উপর মোট শুল্ক আসিয়া ৩৭৷৷৹ টাকায় উপনীত হইয়াছিল।

কিন্তু এইখানেই এ ব্যবস্থার শেষ হয় না। অষ্টাদশ শতাব্দী আরম্ভ হইতে না হইতেই ভারতীয় বস্ত্রের প্রতি ইংলণ্ডের বিদ্বেষ আরও প্রবল হইয়া দেখা দেয়। ১৭০০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড ৯,৫১,১০৯ খণ্ড কালিকো এবং ১,১৬,৪৫৫ খণ্ড বাংলার কারুকার্য্য খচিত রেশমের বস্ত্র আমদানী করিয়াছিল। ফলে লণ্ডনের প্রায় ৩০০০ তাঁতির একটি জনতা ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গৃহ আক্রমণ করে। তাহারা যখন কোম্পানীর ধন-ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিতে উদ্যত তখনই তাহাদিগকে সৈন্যের সাহায্যে বিতাড়িত করা হয়। ছাপের কাজ করা ভারতীয় বস্ত্র যাঁহারা পরিধান করিতেন তাঁহাদের উপরে নির্ম্মমভাবে অত্যাচার সুরু হইয়া যায়। 'হাউস-অব-কমন্সে' ভারতীয় বস্ত্রের বহিষ্কার সম্বন্ধেও এই সময়েই আলোচনা চলিতেছিল। বহিষ্কার বিল যাহাতে নির্ব্বিবাদে পাশ হইয়া যায় সেজন্য প্রায় ৫০০০ তন্তুবায় রমণী জন-সাধারণের এই মহাসভাতেও চড়াও করিতে দ্বিধা করে না। প্রথমে দরদালানে উপস্থিত হইয়া পরে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিবার জন্য তাহারা পীড়াপীড়ি করিতে থাকে। ফলে যে উপদ্রবের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাকে প্রশমিত করিতে 'হাউস-অব কমন্সকে' যথেষ্ট বেগ পাইতে হয়, সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দিয়াই এই উপদ্রবের হাত হইতে তাঁহারা নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন। যে সমস্ত সভ্য বিলের বিরুদ্ধে ছিলেন তাঁহারা অতিমাত্রায় ভীত হইয়া পড়েন। কিন্তু বিলের পক্ষে যাঁহারা, তাঁহাদের কোনোই আশঙ্কা ছিল না। অবশেষে এই রমণীদের অভিপ্রায় অনুসারেই

পার্লিয়ামেণ্ট হইতে আইনও পাশ হইয়া যায়। এই আইনের মর্ম্ম ছিল—১৭০১ খৃষ্টাব্দের ২৯শে সেপ্টেম্বর হইতে কারুকার্য্য খচিত রেশমের বস্ত্র, বাংলাদেশের উৎপন্ন বস্ত্র, পারস্য, চীন অথবা ইষ্ট-ইণ্ডিজের রেশম ও পশমের মিশ্রিত বস্ত্র, ছাপ বা রং-এর কাজ করা কালিকো, এক কথায় বিদেশী সর্ব্ব প্রকার বস্ত্রই আবার রপ্তানী না করা পর্য্যন্ত গুদাম ঘরে মজুত রাখা হইবে। পোষাক-পরিচ্ছদ বা ঘরের আসবাব-পত্রের জন্য কেহই আর তাহা ব্যবহার করিতে পারিবে না। এই আইন লঙ্ঘন করিলে সে সব পণ্য তো বাজেয়াপ্ত হইবেই, যাহাকে এই নিয়ম ভঙ্গ করিতে দেখা যাইবে তাহাকে ২০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ৩০০০ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত করিতে পারা যাইবে। ইহা ছাড়া এই বৎসরেই ভারতীয় কারুকার্য্য-খচিত রেশমের বস্ত্র, রঙ্গিন কার্পাস-বস্ত্র ও মস্‌লিন এবং সাদা মস্‌লিন, এমন কি মোটা বস্ত্রের উপরেও শতকরা ১৫৲ টাকা হিসাবে শুল্কের হার আবার নূতন করিয়া বাড়াইয়া দেওয়া হয়।

১৭০৩ খৃষ্টাব্দে প্রত্যেক পণ্যদ্রব্যের উপর 1/3 Subsidy এবং 2/3 Subsidy নামে দুইটি শুল্ক বসানো হয়। প্রথমটির পরিমাণ ছিল ১ পাউণ্ড ১৩ শিলিং ৪ পেন্স, দ্বিতীয়টির পরিমাণ ছিল ৩ পাউণ্ড, ৬ শিলিং ৯ পেন্স। ইহা ছাড়া সাদা কালিকোর উপর শতকরা ১৫৲ টাকা হিসাবে একটি বিশেষ শুল্কও স্থাপিত হয়। ১৭১০ সালে ছাপ দেওয়া ও ডোরা কাটা কাপড়ের উপরে শতকরা ১৫৲ টাকা হিসাবে আবার একটি নূতন শুল্ক বসানো হয়।

১৭১২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই ইংলণ্ডে কালিকোতে ছাপ দেওয়া ও রং ধরানোর ব্যবসা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই শিল্পটিকে

নষ্ট করিবার জন্য এইবার ইংলণ্ডের মাথার টনক নড়িয়া উঠে। ফলে ইংলণ্ডে যে সব কালিকোতে রং দেওয়া হইত, ছাপ দেওয়া হইত বা চিত্র করা হইত তাহার প্রত্যেক বর্গ গজের উপর ১৭১২ খৃষ্টাব্দে ৩ পেন্স এবং ১৭১৪ খৃষ্টাব্দ ৬ পেন্স হারে শুল্ক বসানো হয়। 'Proposals humbly offered to the House of Commons' নামক রচনার লেখকের হিসাব অনুসারে জানা যায় যে, সেই সময়ে ইংলণ্ডে প্রতিবৎসর এক কোটি বিশলক্ষ খণ্ডেরও বেশী কালিকো এবং শনের বস্ত্র রং করা হইত এবং ইহার প্রত্যেকটি খণ্ডের দৈর্ঘ্য ছিল ১৮ গজ। এই অঙ্কটি হইতে ভারতবর্ষের রপ্তানীর পরিমাণ এবং সেই রপ্তানীর দ্বারা ইংরেজেরা রং, ছাপ প্রভৃতির কত বড় একটা ব্যবসা ফাঁদিয়া বসিয়াছিল তাহারও পরিচয় পাওয়া যায়।

১৭০০ খৃষ্টাব্দে যে আইন পাশ হইয়াছিল সে আইন তেমন কড়াক্কির ভাবে কার্য্যে পরিণত না হওয়ায় বিদেশী বস্ত্রের আমদানী ইংলণ্ডে বন্ধ করা সম্ভবপর হয় নাই। তাই আন্দোলন আরও তীব্র হইয়া উঠে। ফলে ১৭২০ খৃষ্টাব্দে পার্লিয়ামেণ্ট হইতে আবার একটি আইন পাশের দ্বারা ভারতবর্ষ হইতে যে সমস্ত রেশম ও কার্পাস বস্ত্র রং বা ছাপা হইয়া আসে তাহার পরিধান বা ব্যবহার নিষিদ্ধ যায়। এই আইন অমান্য করিলে ব্যবহারকারীর পাঁচ পাউণ্ড বা ৭৫৲ টাকা এবং বিক্রয়কারীর ২০ পাউণ্ড বা ৩০০৲ টাকা অর্থ দণ্ডের ব্যবস্থা হয়।

১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে শতকরা পাঁচটাকা হিসাবে আবার একটি অতিরিক্ত শুল্ক বসানো হয়। ঐ বৎসরের আমদানীর সর্ব্বপ্রকার পণ্য দ্রব্যের উপরেই এই শুল্ক আদায় করা হইয়াছিল। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে মসলিন ও কালিকোর

উপর নির্দ্দিষ্ট শুল্কের পরিমাণ সর্ব্বশুদ্ধ ৩৭ পাউণ্ড ৫ শিলিং ১১ পেন্সে আসিয়া দাঁড়ায়। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে মস্‌লিন ও কালিকোর উপর শুল্কের পরিমাণ যথাক্রমে শতকরা ২৭$\frac{১}{৩}$ এবং ৭১$\frac{২}{৩}$ এবং ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ৩৭$\frac{১}{২}$ ও ৬৭$\frac{১}{২}$ নির্দ্দিষ্ট হয়।

কিন্তু কর্তৃপক্ষের এই সব অন্যায় জবরদস্তিতে সাধারণ লোক খুসী হইলেও তাহা যে ন্যায়-নিষ্ঠ অনেক নর-নারীর ব্যক্তিত্বেও ঘা দিয়াছিল তাহাতে ভুল নাই। তাই অনেকে ইহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া দণ্ড নিতেও দ্বিধা করেন নাই। এইরূপ একটী মনোবৃত্তির ইঙ্গিতই ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'A plan of English commerce' নামক রচনায় পাওয়া যায়। কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ঃ—"আমি যদি মহিলাদিগকে জিজ্ঞাসা করি—তাঁহারা আইনের নির্দ্দেশ অথবা পার্লিয়ামেন্টের বিধান অনুসারে নিজেদের বেশ-ভূষা রচনা করিতে প্রস্তুত আছেন কিনা, তবে তাঁহারাও জিজ্ঞাসা করিবেন—আমরা তাঁহাদিগকে আইনের ভয়ে বেকুব করিয়া রাখিতে চাহি কি না? তাঁহাদিগকে সং বা ছবি করিয়া তুলিবার ইচ্ছা আমাদের আছে কিনা? তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিবেন—আমাদের খুশীর খেয়াল মিটাইবার জন্যই কি নারীদের সৃষ্টি? তাঁহাদিগকে ভারতীয় রাণী সাজানো ছাড়া কি পার্লিয়ামেন্টের আর কোনো কাজ নাই? ইংরেজ পুরুষদের মতই তাঁহাদেরও স্বাধীনতা আছে। যাহা খুশী বলিবার যেমন তাঁহাদের অধিকার আছে, তেমনি যাহা খুশী করিবার ও যেরূপ বেশ-ভূষায় খুশী সেইরূপ বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইবারও তাঁহাদের অধিকার আছে।"

এই সব রচনা হইতেই মনে হয় কেবলমাত্র আইনের রূঢ় আঘাতের দ্বারাই হয়তো এ মনোবৃত্তিকে দমন করা সম্ভব হইত না। আইনের বলে

শুল্কের পর শুল্ক বাড়িয়া উঠিতে পারিত বটে, কিন্তু এই শুল্কের দাবী মিটাইয়াও ভারতীয় পণ্যের ক্রেতার অভাব ইংলণ্ডে একেবারে হয়তো না-ও হইতে পারিত। কারণ এই শুল্কের ক্রম-বৰ্দ্ধমান চাপ সহ্য করিয়াও ইংলণ্ডে ভারতীয় বস্ত্রের আমদানী যে বাড়িয়াই উঠিতেছিল তাহার পরিচয় ভারতীয় পণ্যের রপ্তানীর ভিতর দিয়াই পাওয়া যায়। হিসাব দেওয়া গেল—

বৎসর	কালিকো হাজার খণ্ড হিসাবে	রঙ্গিন কালিকো হাজার খণ্ড হিসাবে	ছাপানো রেশমীবস্ত্র হাজার খণ্ড হিসাবে
১৭০১-১০	৫১৮.৩	.....	২৭.৪
১৭১১-২০	৯৬৫.৭	৪১.৫	২৪.৯
১৭২১-৩০	৯২৬.৫	১২৭.৩	৫২.০
১৭৩১-৪০	৯৮০.৪	২০১.২	৬৯.৮
১৭৪১-৫০	৯৩৩.৪	২৮১.৮	৩৭.৩

এইজন্যই আমার মনে হয়, কেবলমাত্র আইনের উপর নির্ভর না করিয়া সাহিত্যের ভিতর দিয়া ও কাব্যের ভিতব দিয়াও ইহার বিরুদ্ধে আলোচনা সুরু হইয়াছিল। ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের সাহিত্যিক আন্দোলনের পরিচয় পূর্ব্ব প্রবন্ধে দিয়াছি। তাহাদের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া কেবলমাত্র একটি নমুনা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। এই নমুনাটির মধ্যে পূর্ব্ব প্রকাশিত মন্তব্যগুলির মত কড়া ঝাঁঝ, বা অত্যুগ্র জ্বালা নাই। কিন্তু মিষ্টি কথায় বিদ্রোহীদের মন শান্ত করিবার একটি চেষ্টা আছে। যাঁহারা আইনের জবরদস্তি এবং কড়া কথার ঝাঁঝে জিদ করিয়া ভারতীয় বস্ত্রের অনুরাগকে জিয়াইয়া রাখিয়াছিলেন, এই ধরণের

মিষ্টি কথার ফাঁদে পড়িয়াই যে তাঁহাদের অনুরাগ মন্দীভূত হয় নাই তাহাই বা কে বলিতে পারে? উদ্ধৃত রচনাটি একটি কবিতার অংশ। ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে Gentleman's Magazine নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল:—

"তুঁত-পোকারা রেশম কেটে গড়্‌ল পোষাক দিল্-বাহার,
ভারত হ'তে বস্ত্র এলো কি চমৎকার রূপ তাহার;—
মুগ্ধ আঁখি,— তবু যা ক'ন দেশ জননী শোন্ সবায়,
বিদেশী ঐ বস্ত্র গুলোর নির্ব্বাসনের কর্ উপায়।
নইলে দেশের যে সব মজুর চাকুরী খুঁজে আজ পাগল,
তাদের রোষই ধ্বসাবে ঐ শিল্প-রাজের তাজমহল।"

এই সব আইন ও আন্দোলনের ফল কি হইয়াছিল আজ সে কথা কাহারো অজ্ঞাত নহে। ইংরেজদের বস্ত্র-শিল্পের বিপুল বিস্তার এবং ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পের শোচনীয় অধঃপতনের ভিতর দিয়াও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং তাহার আলোচনা না করিয়া এই আইনগুলি সম্বন্ধে কয়েকজন বিদেশী মনীষীর মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। তাঁহাদের উক্তির ভিতর দিয়াই তাঁহারা এই আইনগুলি কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

"১৭০০ খৃষ্টাব্দের গৃহিত আইনটি ১১ই এপ্রিল রাজার অনুমোদন লাভ করে। আইনটির মর্ম্মার্থ ছিল—১৭০১ খৃষ্টাব্দের ২৯শে সেপ্টেম্বর হইতে ভারতীয় কোনো শিল্প বা কালিকো যদি বিলাতে আমদানী করা হয় তবে তাহা বিলাতে ব্যবহৃত হইবে না। তাহা গুদামে বন্ধ করিয়া রাখা হইবে বা ভারতে ফেরৎ পাঠানো হইবে।"—সার জর্জ্জ বারডুড্

"উদার-খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী কোনো ইংরেজ রমণীর পক্ষে ভারতীয় কালিকোর দ্বারা প্রস্তুত কোনো পরিচ্ছদ পরিধান করা নিষিদ্ধ ছিল। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে একজন মহিলার রুমাল ভারতের বস্ত্রে প্রস্তুত বলিয়া প্রমাণিত হওয়ায় বিচারে তাঁহার ৩০০০৲ টাকা জরিমানা হয়।"—অধ্যাপক লেকি

"সংরক্ষণ নীতি বা গবর্ণমেণ্টের সাহায্যের দ্বারা পুষ্ট না হইয়া ইংলণ্ডের কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। ব্যবসার জগতে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য অনন্য-সাধারণ সঙ্কীর্ণতা এবং স্বার্থপরতা আমেরিকাকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে, আয়রল্যাণ্ডের উন্নতিশীল শিল্পকে নষ্ট করিয়াছে, ভারতবর্ষের কালিকো শিল্পকে ধ্বংস করিয়াছে। এই নিমিত্ত দেশের ক্রেতাদিগকে প্রয়োজনীয় প্রায় প্রত্যেক জিনিষের জন্যই, ব্যবসাতে একাধিপত্য লাভ করিতে হইলে যে আনুসঙ্গিক দুর্ম্মূল্য দিতে হয় তাহাও দিতে হইয়াছে"

—অধ্যাপক লেকি

"ভারতীয় সূতি ও রেশমের বস্ত্র তখন (১৮১৩) পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের বাজারে ঢের লাভে বিক্রয় হইত। ইংলণ্ডের প্রস্তুত বস্ত্র হইতে তাহার দাম শতকরা অন্ততঃ ৫০৲।৬০৲ টাকা কম ছিল। সুতরাং ইংলণ্ডের এই বস্ত্র-শিল্প বাঁচাইবার জন্য ভারতীয় বস্ত্রের উপর শতকরা ৭০৲।৮০৲ টাকার ট্যাক্স বসাইয়া, কোথাও বা স্পষ্ট নিষেধ দ্বারা ভারতীয় বস্ত্রের ইংলণ্ডে প্রবেশ বন্ধ করা হয়। ব্যাপার এরূপ না দাঁড়াইলে পিইসলে এবং ম্যাঞ্চেষ্টারের কলগুলি গোড়াতেই অচল হইত, বাষ্পের আবিষ্কার সত্ত্বেও তাহাদের পুনরায় গতি লাভের কোনোই সম্ভাবনা থাকিত না। ভারতীয় বস্ত্র-শিল্পের ধ্বংসের দ্বারাই তাহাদের প্রতিষ্ঠা। ভারতবর্ষ যদি

স্বাধীন হইত তবে সেও ইহার প্রতিশোধ লইতে পারিত ; সেও ব্রিটিশ-পণ্যের উপর খুব চড়া শুল্ক বসাইয়া তাহার নিজের লাভজনক ব্যবসাকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিতে পারিত। কিন্তু এই আত্মরক্ষার ব্যবস্থা তাহাকে অবলম্বন করিতে দেওয়া হয় নাই। সে ছিল তখন বিদেশী বণিকদের অনুগ্রহের ভিখারী। ব্রিটিশ শিল্প বিনা শুল্কেই তাহাদের ঘাড়ে চাপানো হইয়াছিল। বিদেশী বণিকেরা রাজনৈতিক অবিচারের অস্ত্রে তাহাকে পরাজিত করিয়া অবশেষে গলা টিপিয়া হত্যা না করিলে, সমতলের উপর দাঁড়াইয়া যদি যুদ্ধ চলিত তবে এই প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করা তাহার পক্ষে কখনো সম্ভব হইত না।”

এ মন্তব্য বিখ্যাত ঐতিহাসিক মিলের। এই উক্তির পর অন্য কোনো মত উদ্ধৃত করা, বা নিজেদের মন্তব্য প্রকাশ করা সম্পূর্ণই অনাবশ্যক বলিয়া মনে হয়।

বিভিন্ন দেশে চরকার স্থান

যে তর্কের কোনো ভিত্তি নাই তাহাই লইয়া আমরা মাতিয়া উঠিয়াছি। কাজের পরিবর্তে কথার পিরামিড আকাশকে স্পর্শ করিবার উপক্রম করিয়াছে।—এমনই হয়। সত্যকার কাজের ইচ্ছা যেখানে নাই, কাজেকে ফাঁকি দিবার জন্য যুক্তি-তর্কের অবতারণা সেখানে এমনি ভাবেই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

কথাটা আর একটু খুলিয়া বলি। দেশ-নায়কেরা বলিতেছেন, চরকা কাট, তোমাদের বস্ত্রের সমস্যা অতি সহজেই সমাধান হইবে। আমরা বলিতেছি—ও ছেঁদো কথা, যন্ত্রের সম্মুখে দেড়টাকা দামে কয়েকখানা কাঠের তৈরী মান্ধাতার যুগের ঐ হাতিয়ারটি নাকি আবার টিকিতে পারে? প্রতিযোগিতায় যেখানে সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি চলিতেছে, সেখানে সে কালের একেবারে অনাড়ম্বর চরকা কি করিতে পারে?

কি যে করিতে পারে, কাজে করিয়া দেখিবার ধৈর্য্য তো আমাদের নাই-ই যাঁহারা করিয়া দেখাইতেছেন তাঁহাদের কাজটাও অভিনিবেশ সহকারে যে পরীক্ষা করিব, মনের ভিতর সে ইচ্ছাটাও আমরা জাগাইয়া তুলিতে পারি না। পরন্তু আমাদের মন এমনি ভাবেই মোহগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, চরকার বিরুদ্ধে উপেক্ষার শাণিত অস্ত্র ব্যবহার করিতে পারিলেই যেন সে খুসী হইয়া উঠে। তাই তীক্ষ্ণধার বুদ্ধিকে নানারকমে শানাইয়া আমরা কুট যুক্তির আমদানি করি, মিথ্যা তর্কের সৃষ্টি করি এবং

কথার খড়্গে সত্যকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দিয়া আত্মপ্রসাদের অট্টহাস্যে সভাগৃহকে গুল্‌জার করিয়া রাখি।

ইহার কারণ কি জানি না, কিন্তু একটু ধীরভাবে চিন্তা করিলেই বোঝা যায়, প্রতিযোগিতার যে আশঙ্কায় আমরা ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছি সে আশঙ্কা একেবারেই অনর্থক। স্বদেশী মিলের সঙ্গে বিদেশী মিলের প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা আছে, এবং যে হেতু দেশ পরাধীন ও ভারতবাসীরা অসম্ভব রকমে দরিদ্র, সেই হেতু এই মিলে মিলে প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষের জয়লাভের আশাও দুরাশা মাত্র। কিন্তু চরকা ও মিলে প্রতিযোগিতার প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

কথাটা শুনিতে অদ্ভুত বলিয়া মনে হইতে পারে, কারণ সহজ ও সরল সত্য, সহজ ও সরল বলিয়াই অধিকাংশ ক্ষেত্রে অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সত্যের প্রতিষ্ঠার যে তাহাতে বিন্দুমাত্র লাঘব হয় না, বুদ্ধের বাণী, খৃষ্টের বাণী, যে কোনো মহাপুরুষ বা যুগ-প্রবর্ত্তকের বাণীই তাহার প্রমাণ।

খদ্দর যে প্রতিযোগিতার বাহিরে তাহার কারণ, ব্যবসা-বাণিজ্য বা ব্যক্তিগত লাভালাভের যে-লোভ মানুষকে পরস্পরের প্রতি প্রতিযোগিতায় উত্তেজিত করে, খদ্দরের সহিত সেই ব্যবসা-বাণিজ্যেরই সম্পর্ক নাই। ইহা ব্যাপক ভাবে লাভের বেসাতিও নহে। পারিবারিক অপরিহার্য্য প্রয়োজনের জিনিষ, পরিবারের ভিতরে উৎপন্ন করিয়া লওয়ার যে সার্থকতা সেই সার্থকতাই ইহাকে মর্য্যাদা দান করিয়াছে। বস্তুতঃ যে মনোবৃত্তির দিকে লক্ষ্য করিয়া আহার্য্য প্রস্তুত এবং পরিবেশনের ভার গৃহের ভিতরেই আবদ্ধ রাখা হয়, সেই মনোবৃত্তিই অশনের পরেই যে জিনিসটার প্রয়োজন সেই বসনকেও ঘরে তৈরী করিবার প্রবৃত্তিটাকে সমর্থন করি। খাদ্যকে

যে কারণে যন্ত্রদেবতা প্রতিযোগিতায় আহ্বান করিতে পারে না, সেই কারণেই বস্ত্রকেও তাহার প্রতিযোগিতার আহ্বান করিবার অধিকার নাই।

কোয়েম্বাটুরের শ্রীযুক্ত বালাজীরাও "Peoples of all nations" হইতে কতকগুলি অংশ বহু চেষ্টায় সংগ্রহ করিয়া বিতরণের জন্য ছাপাইয়াছেন। এই অংশগুলি পাঠ করিলে বুঝা যায়, যন্ত্র-যুগের এই মহা মর গুমেও চরকার দাবী মুছিয়া যায় নাই, সেই আদিম যুগের চরকা পৃথিবীর অন্যান্য জাতির ঘরে ঘরে আজিও টিঁকিয়া আছে এবং বেশ বড় স্থান অধিকার করিয়াই টিঁকিয়া আছে। কিছু সংক্ষিপ্ত আকারে তাঁহার সংগৃহীত বিবরণগুলি এখানে ভাষান্তরিত করিয়া দেওয়া গেল :—

"এবিসিনিয়া—এবিসিনিয়ার অভিজাত সম্প্রদায় ইয়র্কশায়ারের পশমের তৈরী ম্যাঞ্চেষ্টারের 'সাটের কাপড়ের' অতিশয় আদর করিয়া থাকেন। কিন্তু সেখানকার কৃষকগণ, হাতে যাহা তৈরী করে তাহা লইয়া যে কোনো কারখানার সহিত টক্কর দিতে পারে। নিজের ক্ষেতে সে তুলা জন্মায়; সেগুলি ধুনিয়া লইয়া সূতা কাটে এবং সেই আদিম কালের তাঁতের সাহায্যে কাপড় বুনে। এই নরম নিখুঁত এবং উষ্ণ বস্ত্র হইতে তাহারা তাহাদের লম্বা, সাদা জাতীয় পোষাক তৈরী করিয়া লয়।

"বেলজিয়াম্—প্রাচীন ব্যক্তিরা হস্ত-শিল্পের সাহায্যে সদুপায়ে জীবন ধারণ করেন। নিপুণ গৃহিনীপণা বেলজিয়ান্ রমণীর গর্ব্বের বস্তু। প্রায় ঘরে ঘরেই চরকা আছে এবং তাহার সাহায্যে কৃষকগণ নিজেদের উৎপাদিত সূতা কাটিয়া নিজেদের পোযাক তৈরী করে।

"বুলগেরিয়া—কোনো হাটবারে 'টারনোভো'তে গেলে বুলগেরিয়াবাসীর মিতব্যয়িতা ও কর্ম্মশীলতা—এই দুইটি গুণের বেশ পরিচয় পাওয়া যায়।

রমণীরা শাক-সব্জী বেচিতে আসিয়া খরিদ্দারের জন্য অপেক্ষা করিতেছে, আর সেই ফাঁকে বসিয়া বসিয়া চরকায় সূতা কাটিয়া লইতেছে।

"চেকোশ্লোভেকিয়া—বস্ত্র-বয়ন ব্যাপারের যাহা কিছু কাজ—তুলা-ধোনা, সূতা-কাটা, কাপড়-বোনা, রং-করা ইহার কোনোটার জন্যই কৃষকদিগকে তাহাদের গৃহের বাহিরে যাইতে হয় না এবং সমস্ত কার্য্যই পরিবারের লোকেরাই করিয়া থাকে।

"চীন—নিম্নশ্রেণীর লোকদের যে পরিমাণ পরিচ্ছদের দরকার তার পাঁচ ভাগের চারভাগই যোগানো হয় গৃহ-শিল্প হইতে। সূতা কাটা এবং কাপড় বোনা আজও সেখানে স্ত্রীলোকদের শিল্প বলিয়াই পরিগণিত। চীনের লোকেরা এখনও বস্ত্র বয়নের প্রাচীন প্রথারই অনুসরণ করিতেছে। কল-কারখানা আসিয়া আজও তাহাদের সে প্রথা লুপ্ত করিয়া দেয় নাই।

"ইকুয়েডর—ইকুয়েডরের অধিবাসীগণ যেখানেই যান প্রায় সব সময়েই সূতা কাটার সাজ-সরঞ্জাম সঙ্গে রাখেন এবং হাতে যদি আর কোনো কাজ না থাকে তবে দেখা যায়, তাঁহাদের চটুল আঙ্গুলগুলি অনবরত ঘুরিতেছে ফিরিতেছে এবং তাহা সূতা পাকানো ও সূতা জড়ানোর কাজেই নিযুক্ত আছে। এই সূতা কাটার দরুণ যে তাঁহাদের আর আর কাজে কোনো দিক হইতে এক চুলও ক্ষতি হয় তাহা নহে। অতি সাদাসিধে ধরণের তাঁত—তাহা হইতেই নানা রকমের সুন্দর সূতী এবং পশমী কাপড় তৈরী হয়। তাঁহাদের এই কাপড় হইতেই 'পোঙ্কো' (দক্ষিণ আমেরিকায় ব্যবহৃত ঢিলা জামা) এবং আরও নানা রকমের গরম পোষাক তৈরী হইয়া থাকে।

"কুইচা রমণীগণ যখন যেখানে যান সর্ব্বদাই চরকী এবং টাকু সঙ্গে লইয়া থাকেন (চরকী একটা সাধারণ রকমের লাটি বিশেষ এবং টাকু একগাছি

বেত, তাহার মাথায় একটা আলু গাঁথা) এবং হাতে অন্য কোনো কাজ না থাকিলেই সূতা কাটিয়া থাকেন।

"ইকুয়েডরের অধিবাসীদের তৈরী 'পোঙ্কো' কাপড় এবং পণ্যদ্রব্য সব দিক দিয়াই উৎকৃষ্ট জিনিষ। ইহার ভিতরে আবার যেগুলি সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাহা পার্ব্বত্য প্রদেশের পশম হইতে বোনা হয়।

"ইংলণ্ডের সমতল ভূমি—উইণ্টশায়ার প্রদেশের প্রত্যেক গ্রামে চরকার চাকা মধুর শব্দে ঘুরিতেছে। উইণ্টারস্লো সেলিসবেরির সমভূমিতে অবস্থিত আর একটি গ্রাম। এ জায়গাটিও ইহার বস্ত্র-শিল্পের জন্য বিখ্যাত। নিজ হাতে সূতা কাটিয়া গ্রামবাসীরা এই বস্ত্র বয়ন করিয়া থাকে ; সমতল ভূমিতে অনেক মেষ পাওয়া যায়—এই সব মেষ হইতেই বস্ত্র-বয়নের উৎকৃষ্ট পশম সংগৃহীত হয়। 'ডাচেস অব হ্যামিণ্টন' যে শ্রম-শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, গ্রামবাসীরা উৎসাহের সহিত আজিও তাহার অনুসরণ করিতেছে। অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালিকাদিগকে এ সম্বন্ধে বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে এবং বাড়ীতেও তাহারা নিজেদের টেকো লইয়া কাজ করিতেছে।

"এস্থোনিয়া—এস্থোনিয়ান সুন্দরীরাও চরকায় সূতা কাটেন। ইসেল দ্বীপে বাতাসের বড় জোর—যেন গায়ে আসিয়া বিঁধে। কাজেই পশমী কাপড়ের চাহিদাও খুব বেশী। গ্রীষ্মকালে প্রায়ই দেখা যায়, সুন্দরী তরুণী গৃহিণীরা তাঁহাদের ক্ষুদ্র গৃহখানির বাহিরে রৌদ্রে আসিয়া বসিয়াছেন আর চরকা লইয়া পশম হইতে সূতা কাটিতেছেন। এই সূতা হইতে যে গরম পোষাক তৈরী হয় তাহার দ্বারাই তাঁহাদের নিজের এবং পরিবারের পরিচ্ছদ প্রস্তুত হয়।

"ফ্রান্স—ডিনান নামক স্থানের বহির্ভাগে যে সব বৃদ্ধা পল্লী-মহিলা বাস করেন, চরকী ঘুরাইতে ঘুরাইতে কম্পিত স্বরে চরকা সম্বন্ধীয় নানা পুরানো গানও তাঁহারা গাহিয়া থাকেন। ব্রিটেনিতে চরকা চালানো আজও প্রচলিত আছে এবং ব্রিটন রমণীগণ তাঁহাদের বস্ত্র সম্বন্ধে যে গর্ব্ব অনুভব করিয়া থাকেন সে গর্ব্বেরও যথার্থ হেতু আছে। তাঁহাদের বস্ত্র বাড়ীর সূতাতে তৈরী বলিয়া এবং অতিশয় সতর্কতার সহিত ধোয়া হয় বলিয়া খুব টেকসই হয় এবং অনেক গৃহে তাহা প্রচুর পরিমাণে তৈরী হয়। সেই শুভ্র বস্ত্রের সুন্দর টুপি এবং মজবুত পোষাকে সজ্জিত হইয়া সেখানকার মহিলারা যখন চরকা কাটিতে থাকেন তখন তাঁহাদিগকে দেখিয়া প্রাচীন কালের রমণী-সুলভ মিতব্যয়িতা এবং শ্রমশীলতার ছবিটিই মনের ভিতর জাগিয়া উঠে।

"গ্রীস্—সদর রাস্তার একঘেয়ে ভাবকে দূর করে সেখানকার উদ্ভাবনী শক্তির অভিনবত্ব। ডেলফির সন্নিকটে একটি পার্ব্বত্য পথ আছে। শুদ্ধ একটা নূতন কিছু করার খাতিরে গ্রীক তরুণীরা ঘোড়ায় চড়িয়া এই পথে যাইতে যাইতে চরকী ও টেকো লইয়া সূতা কাটেন; এ দৃশ্য এমন যে, ইহার জোড়া মেলে না। তাঁহারা আবার এরূপ পাকা ঘোড়-সোয়ার যে, পদ-স্খলনের ভয়টুকু পর্য্যন্ত তাঁহাদের নাই—ঘোড়াও চলে সম্পূর্ণ তাঁদের ইঙ্গিত অনুযায়ী। গ্রীক রমণীগণ তাঁহাদের চির-প্রশংসিত এই শ্রম-শিল্পের ভিতর দিয়া উজ্জ্বল মধ্যাহ্নের মুহূর্ত্তগুলিকে এমনি করিয়াই মধুর ও লোভনীয় করিয়া তোলেন।

"সেখানকার বসত বাড়ীগুলিই যেন এক একটি কারখানা। ল্যাঙ্কাশায়ারের পণ্য যখন সকল দেশেই সুলভ, তখন কেহ ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেবল সূতা কাটায় ও বস্ত্র-বয়ন-শিল্পের কাজে ব্যয় করিতে পারে ইহা খুবই

আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হইবার কথা। কিন্তু তথাপি গ্রীসের নানাস্থানে এই হস্ত-শিল্পটি আজও যথেষ্ট সজীব আছে। এখনও ইহা এরূপ ভাবে সমাদৃত হয় যে, জিনিষ তৈরী হওয়ার আগে ইহার যে দাম কল্পনাও করা যায় না, তৈরী হইয়া গেলে ইহার প্রয়োজন তাহার অপেক্ষা ঢের বাড়িয়া যায়।

"হাঙ্গেরী—নগ্ন-পদ হাঙ্গেরিয়ান রমণীগণ সবুজ পাহাড়ের ধারে ধারে চরকি এবং টেকো লইয়া আপন মনে ঘুরিয়া বেড়ায়—আঙ্গুলগুলি তাহাদের বিশ্রাম জানে না। এমনি অনাড়ম্বর ভাবে হাঙ্গেরী অনেক প্রাচীন শিল্পকে রক্ষা করিয়া আসিতেছে।

"আয়র্ল্যাণ্ড—সেই সাবেক কালের চরকার চলন আজও এখানকার পল্লীতে পল্লীতে অব্যাহত রহিয়াছে। এই সাধারণ যন্ত্রে এবং হাতে কাটা সূতায় তাহারা এক এক সময় এমন বস্ত্র তৈরী করে যে, আধুনিক কল-কারখানায় তৈরী বস্ত্র তাহার সামনেও দাঁড়াইতে পারে না।

"প্যালেষ্টাইন্—জেরুজালেমে নানা দেশীয়, নানা জাতীয় লোকের ভিড়। তাহার মধ্যেও পাগড়ী মাথায় মেষ চর্ম্মের কোট গায়ে গ্রাম্য বৃদ্ধগণ যখন নিজ মনে সূতা পাকাইতে থাকেন, তাঁহাদের অস্তিত্ব আপনা হইতেই স্বপ্রকাশ হইয়া পড়ে।

"প্যারাগুয়ে—লেঙ্গুয়ার লোকেরা মাত্র একখানি কম্বল কোমরে জড়াইয়া রাখে। সেখানকার স্ত্রীলোকেরা পশম হইতে সূতা কাটিয়া কাপড় বুনে এবং সেগুলি দেখিতেও খুব সুন্দর হয়। রঙ্গীন কাপড়ের অনেক নমুনা সেখানে দেখা যায়; স্বাভাবিক পশম হইতে তৈরী হয় কালো আর সাদা রং, লাল রং তৈরী হয় এক প্রকার শুষ্ক কীট হইতে, আর গাছের ছাল হইতে তৈরী হয় হল্‌দে এবং বাদামী রং। অনেক

সময়ে লেঙ্গুয়ার রমণীদিগকে তাহাদের নিজেদের ব্যবহারের জন্যও বস্ত্র বুনিতে দেখা যায়। হাতে কাটা সূতার সাহায্যে তাহারা এগুলি প্রস্তুত করে।

"পেরু—ছেলে-মেয়েদের দেখা-শুনা অথবা ভেড়ার দিকে নজর রাখা—যে কাজেই পেরুভিয়ান চোলা রমণী ব্যস্ত থাকুন কেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে সূতা কাটাও তাঁহার অনিবার্য্য ভাবেই চলা চাই। ছোট একটা টাকু অনবরত তিনি পাকাইতে থাকেন, আর নীরস পশমের একটা গুলি হইতে মোটা সূতা তৈরী করেন। পাহাড়ে—জিনিষ-পত্রের আমদানীর স্থান হইতে অনেকটা দূরে বাস করার দরুণ সেখানকার স্ত্রীলোকেরা এত সূতা উৎপাদন করেন যে, তাহার দ্বারাই তাঁহাদের প্রায় সমস্ত পরিচ্ছদ তৈরী হইয়া থাকে।

"পোল্যাণ্ড—ওয়ারস প্রদেশের কৃষকদের কুটিরে চরকা এবং তাঁত চিরদিন সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত। তাহারা তাহাদের গৃহ-শিল্পের প্রতি এতটা নিষ্ঠাবান যে, ভিন্ন জাতীয় পোষাক তাহারা প্রায় ব্যবহার করে না বলিলেই চলে।

"রুমানিয়া—রুমানিয়ান গোয়ালিনীরা এক সঙ্গে দুই কাজ করিয়া থাকে। গো-মেষ প্রভৃতি লইয়া দিনের শেষে যখন তাহারা গৃহের দিকে চলে তাহাদের চঞ্চল অঙ্গুলীগুলি নিযুক্ত থাকে চির পরিচিত টেকো চালানোর কাজে। রুমানিয়ার কৃষক রমণীরা চিরাচরিত প্রথা সমূহের একান্ত ভক্ত। আজিও সূতাকাটা তাহাদের কাছে একটা বিশেষ সম্মানের কাজ বলিয়া গণ্য। অবসর সময়টাতেও রুমানিয়ান্ গৃহিণীকে চরকা ছাড়া থাকিতে দেখা যায় না।

"স্কটল্যাণ্ড—ভাল কাজ ভাল ভাবে সম্পন্ন করায় যেমন আনন্দ আছে, তেমনি লাভও আছে। হেব্রাইডিসের 'হ্যরিস্‌টুইড' (এক প্রকার তের্চ্চা বুননীর পশমী কাপড়) হাতে সূতা কাটিয়া, হাতে বুনিয়া এবং রং করিয়া তৈরী হইয়া থাকে। কোমলতা এবং দীর্ঘস্থায়িতা গুণে এই কাপড় পৃথিবী-ব্যাপী সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে। কুটির-শিল্প হইতে একেবারে বিশ্বের বাজারে বাহির হওয়ায় প্রথম অবস্থাটায় এ ব্যবসা দূর প্রান্তবর্ত্তী হেব্রাইডিস্‌বাসীদের পক্ষে বিশেষ লাভজনক ছিল না। কিন্তু পরে 'হ্যারিস্‌টুইড' শিল্পের এই যে উন্নতি ইহা কুটিরবাসীদের পক্ষে দেবতার বরের মতই ফল প্রসব করিয়াছে। টারবার্ট নামক স্থানে পশম ধূনানোর জন্য দুইটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে এবং দেশের বহু লোক এখানে কাজ করিয়া অন্ন পাইতেছে। সেখানে আরও একটা মালগুদামের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। বাড়ীতে যে সমস্ত 'হ্যারিস্‌টুইড' তাহারা বুনে ও রং করে, এই গুদামে আনিয়া সেগুলি তাহারা জমা দেয়। যে কোমল ও উষ্ণ পশমের জন্য এই সুদূর দ্বীপটি প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে—সৌম্যমূর্ত্তি স্কটল্যাণ্ডের রমণী আপনার লতায় ঢাকা কুটিরখানির বাহিরে বসিয়া সেই পশম ধূনিয়া থাকেন ও সেই পশমে সূতা কাটেন।

"সার্ব্বিয়া—যুগোশ্লোভিয়াতে সূতাকাটা, কাপড় বোনা এবং বস্ত্র-শিল্পের কাজ সাধারণতঃ শীতকালেই করা হয়। কেননা তখন কৃষক রমণীদের বাহিরের কাজে মোটেই সময় ক্ষেপ করিতে হয় না। অর্চ্চিডাতে অনেক পুরাতন শিল্পের উন্নতি সাধিত হইতেছে, কিন্তু সেখানকার গৃহিণীদের নিকট সূতাকাটা যেমন আদরের তেমন আর কোনো শিল্পই নহে।

এই যন্ত্র-শক্তি যুগেও যে সেকালের চরকা অচল হইয়া যায় নাই উপরের উদ্ধৃত বিবরণগুলিই তাহার প্রমাণ। চরকা কাটার ভিতর যে একটা সহজ স্বাভাবিক আনন্দ আছে—ইহা তাহার একটি কারণ। কিন্তু ইহাই তাহার একমাত্র কারণ নহে। চরকা একান্ত অনাড়ম্বরের যে আর্থিক সচ্ছলতা আনিয়া দেয়, তাহাই ইহাকে এ যুগেও এমন ভাবে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। কলের সুবিধা এই যে, তাহার যন্ত্র-শক্তি অল্পলোকের দ্বারা বেশী লোকের কাজ করাইয়া লয়। এ সুবিধা সেই সব স্থানের পক্ষেই কল্যাণকর যে সব স্থানে কাজের লোকের অভাব আছে, যে সব স্থানে মানুষ কাজের অভাবে বসিয়া থাকে না, সকলেই কোনো-না-কোনো কাজে নিযুক্ত থাকিয়া জাতীয় সম্পদ ও ব্যক্তিগত প্রয়োজনের চাহিদা মিটাইতে সক্ষম। কিন্তু যে স্থানে কাজের অভাবেই কোটি কোটি লোক বসিয়া থাকে, জাতীয় সম্পদ বাড়ানো দূরের কথা, নিজেদের উদরের অন্ন সংস্থান করিতে না পারিয়া প্রতিদিন কাতারে কাতারে মৃত্যুর তোরণতলে গিয়া হাজিরা দেয়, সে সব স্থানে মিলের প্রতিষ্ঠার দ্বারা লোকের দুঃখ কমে না বরং বাড়িয়াই উঠে। দুনিয়ার এরূপ স্থানের সংখ্যা অল্প নহে—এবং ভারতবর্ষ ইহাদেরই অন্যতম।

কথাটা যে আমাদের স্বকপোল কল্পিত নহে এবং বিশেষজ্ঞরাও যে এ মতকে উপেক্ষা করেন না বরং শ্রদ্ধার সঙ্গেই সমর্থন করেন তাহার পরিচয় প্রচুর পাওয়া যায়। এই চরকার সম্পর্কেই স্যার ড্যানিয়াল হ্যামিলটনের মতটি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। তিনি লিখিয়াছেন :—

"ভারতবর্ষের পল্লীজীবন সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে আমি বলিতে পারি, আধুনিক রাজস্ব-ভাণ্ডার হইতে যথোপযুক্ত সাহায্য ও

সুযোগ যদি দেওয়া হয়, তবে কেবলমাত্র চরকা নহে, তাঁতও বাষ্পশক্তির সহিত অনায়াসেই প্রতিযোগিতা করিতে পারে। কারণ কৃষিকার্য্য বন্ধ থাকার দরুণ বৎসরের যে চারিমাস কাল কৃষকদের সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়, চরকা ও তাঁতের প্রচলন দ্বারা তাহা অতি সহজেই কাজে লাগানো যায়। যে শস্য বা বস্ত্রের জন্য কাঁচামালের দামটাই কেবল ব্যয় হয় সে জিনিষ যে বাজারের যে কোনো শস্য বা বস্ত্র অপেক্ষাই সস্তা হইবে, তাহা সহজ দৃষ্টিতেই ধরা যায়।" স্যার হ্যামিলটনের মতের অনুরূপ মতের অভাব নাই। বস্তুতঃ যাঁহারা চিন্তাশীল অথচ সত্যাশ্রয়ী তাঁহারা সকলেই প্রায় এইরূপ মতই পরিপোষণ করেন।

উল্লিখিত বিবরণেও চরকার শক্তির যে পরিচয় আছে, তাহা দেখিয়া একান্ত ভ্রান্ত সংস্কার-সম্পন্ন লোক ছাড়া আর কেহই চরকার উপযোগিতাকে অস্বীকার করিতে পারিবেন না। বস্তুতঃ চরকার সম্বন্ধে ভ্রান্ত সংস্কারের সব চেয়ে বড় কারণ—ইহার দ্বারা কাটুনীরা যাহা রোজগার করে তাহা নিতান্তই তুচ্ছ। কিন্তু নিজেদের ধারণার কথা ক্ষণকালের জন্য ভুলিয়া গিয়া যদি আমরা একবার লক্ষ লক্ষ অনাহার-ক্লিষ্ট দরিদ্রের মাঝে আসিয়া দাঁড়াই, তাহা হইলে আমরা এক মুহূর্ত্তেই বুঝিতে পারিব, যাহা আমাদের নিকট নিতান্তই সামান্য তাহাই তাহাদের নিকট পরম সম্পদ। আমরা আরও বুঝিতে পারিব যে, লক্ষ লক্ষ লোক—চরকার দ্বারা যাহারা তাহাদের দৈনিক আয় সামান্য কয়েক পয়সা মাত্র বাড়াইতে পারে তাহাদের উপার্জ্জনও দৈনিক কয়েকটি পয়সার বেশী নহে। তাহাদের উপার্জ্জন খুব বেশী হইলেও বৎসরে ৪০্ টাকা অর্থাৎ দৈনিক সাত পয়সা মাত্র।

ভারতবর্ষ ও কুটির-শিল্প

দেশ অতিমাত্রায় দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে একথা আমরা সকলেই জানি, কিন্তু এই দারিদ্র্যের কারণ যে কি তাহা খুঁজিয়া দেখি না। অসহায়ের মত দুঃখ করি, কিন্তু দুঃখ দূর করিবার যে উপায় তাহা গ্রহণ করিবার দিকে কাহারো লক্ষ্য নাই। ফলে হা-হুতাশ ও দীর্ঘশ্বাসই বাড়িয়া উঠিতেছে, দুঃখ বিন্দুমাত্রও কমিতেছে না।

ভারতবর্ষের দুঃখের কারণ কি? তাহার অভাব শস্যের নহে। শস্য এ দেশে প্রচুর পরিমাণেই জন্মায় এবং যে শস্য জন্মায় তাহা দ্বারা এ দেশের ক্ষুধা ষোল আনা মিটানোই সম্ভব। কিন্তু মুস্কিল এই—দেশ যাহাদের শস্য তাহাদের ভাগ্যে জোটে না। নানা পণ্যের বিনিময়ে তাহা সাগর-পারে গিয়া হাজির হয়। দেশের লোক অনাহারে থাকে, অথচ ভারতবর্ষের অন্নে ইউরোপের ক্ষুধা তো মেটেই তাহার বিলাসিতাও মাত্রা অতিক্রম করিয়া মানবতার সীমাকে লঙ্ঘন করিতে বসিয়াছে।

বিদেশ হইতে যে সব পণ্য এ দেশে আসে তাহা দাম ছাড়া আসে না, এ কথা সকলেই জানে। কিন্তু এ দাম যে কেবল টাকাতেই দেওয়া হয় না, তাহা অনেকেরই অজ্ঞাত। বিদেশ হইতে সাধারণতঃ আমরা বিলাস-পণ্যই আমদানি করি, কিন্তু এই সব বিলাস-পণ্যের বিনিময়ে আমাদিগকে দিতে

হয় আমাদের ধান, আমাদের চাল, আমাদের গম এবং এমনি ধরণের নানা রকমের কাঁচামাল ও খাদ্যদ্রব্য।

১৯২৮ সালে এদেশ হইতে

চাল	গিয়াছে	৩৪ কোটি টাকার
ডাল	গিয়াছে	২ কোটি টাকার
গম	গিয়াছে সাড়ে	৫ কোটি টাকার
চিনে বাদাম	গিয়াছে সাড়ে	১৫ কোটি টাকার

জীবন ধারণের জিনিষ যাহারা এইরূপে বিদেশে পাঠায় অনশন যে তাহাদের পক্ষে অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই।

এই চাল-ডাল-গম প্রভৃতি একদিকে যেমন বিদেশী পণ্যের দৌলতে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া দেশের দুর্ভিক্ষকে কায়েম করিয়া তুলিতেছে, অন্যদিকে আবার তেমনি বিদেশী শিল্প দেশী শিল্পকে ধ্বংস করিয়া শিল্পীর রোজগারের পথও বন্ধ করিয়া দিতেছে। তাই কামার, কুমার, ছুতার, তাঁতি, জোলা—সকলের ব্যবসাই আজ ধ্বংসোন্মুখ। তাই দেশে বেকারের সংখ্যার সীমাও আজ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বিদেশী পণ্য ও বিদেশী শিল্প শাঁখের করাতের মতো এমনি করিয়া দুই দিকে দিয়াই আজ জাতির মর্ম্ম-দেশকে ভেদ করিয়া চলিয়াছে।

বিদেশী পণ্য-বর্জ্জনের উপযোগিতা যে দেশের লোকের চোখে আজও ধরা পড়ে নাই তাহা নহে। ধরা পড়িয়াছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও প্রতিকারের পথ সে খুঁজিয়া পাইতেছে না। ইহার এক কারণ ইউরোপের ধাঁজে আমাদের ভিতর যে বিলাসিতার ব্যাধি প্রবেশ করিয়াছে সেই বিলাসিতা। নিত্য-ব্যবহার্য্য প্রয়োজনের বস্তু অপেক্ষাও আমাদের মনে বিলাস-বস্তুর

মোহ আজ বেশী এবং এই মোহ কেবল ভদ্রলোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে, জন-সাধারণের ভিতরও তাহা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ভদ্রলোকের দেখা-দেখি তাহারাও জীবন-যাত্রার আদর্শকে আজ সেই বিলাসের আদর্শেই মাপিয়া লয়। এ দিক দিয়া জাতির যে অধঃপতন হইয়াছে তাহা অসাধারণ।

কিন্তু ইহাই একমাত্র কারণ নহে। দ্বিতীয় কারণ—ইউরোপের ব্যবসা-ব্যবস্থার (Industrialism) আদর্শ। এই আদর্শ আমাদের শিক্ষিত লোকের মগজেও একটা বিরাট মোহের সৃষ্টি করিয়াছে। তাই যে দেশের শতকরা ৯০ জন কৃষক, সেই দেশে তাঁহারা Large scale Industryর প্রতিষ্ঠার জন্য ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন। দেশের দুঃখ সম্বন্ধে যে তাঁহারা অন্ধ তাহা নহে। কিন্তু সে দুঃখকে তাঁহারা দূর করিতে চান সমস্ত দেশকে ইউরোপের মতো বড় বড় কল-কারখানা বা ফ্যাক্টারীর দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া।

এই আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়ার ফলেই দেশে নানা রকমের কল-কারখানা গড়িয়া উঠিতেও সুরু করিয়াছে। কাপড়ের কল, চালের কল, ময়দার কল, তেলের কল—এমনি ধরণের হাজারো রকমে কলের ধোঁয়ায় দেশের আকাশ আচ্ছন্ন-প্রায়। ফলে দেশের কুটির-শিল্পগুলি যাহা এতদিন ধরিয়া কোটি কোটি লোকের অন্ন-বস্ত্রের সমস্যার সমাধান করিয়া আসিতেছে, তাহার অধিকাংশই আজ হয় ধ্বংস হইয়াছে, না হয় আসন্ন ধ্বংসের মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কুটির-শিল্পের ধ্বংসই যে দেশের দারিদ্র্য ও তাহার বর্ত্তমান নিদারুণ নিঃসহায় অবস্থার অন্যতম প্রধান কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই।

যাঁহারা ইউরোপের মোহে পড়িয়া এ দেশকে বড় বড় কারখানার পাদ-পীঠ করিয়া তুলিতে চান তাঁহারা যে একটা মিথ্যা মোহের বশেই ছুটিয়া

চলিয়াছেন, এ দেশের গড়নের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা ধরা পড়ে। যেখানে দেশের লক্ষ লক্ষ লোক কাজের অভাবে বেকার বসিয়া থাকে সেখানকার সমস্যা, যন্ত্র খাটাইয়া সংক্ষেপে কাজ সারিবার উপায় উদ্ভাবন করা নহে, সেখানকার সমস্যা, সমস্ত লোককে কাজ দিবার পথ খুলিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা। এ দেশের ৩১ কোটি ৯০ লক্ষ লোকের ভিতর যন্ত্র-দেবতা ১৪ লক্ষ লোককে আজ কাজ দিতে সক্ষম হইয়াছেন। অবশিষ্ট ৩১ কোটি ৭৬ লক্ষ লোকের জন্য কাজ চাই। যন্ত্র-দেবতা কখনো এত বড় বিরাট কারখানা এ দেশে খুলিয়া দিতে পারিবেন না যাহা ৩১ কোটি লোককে কর্ম্ম দিয়া নিযুক্ত রাখিতে পারিবে। সুতরাং যে কৃষি বর্ত্তমানে ৯০ জন লোককে নিযুক্ত রাখিয়াছে তাহাকে বাতিল করিয়া দিয়া ভারতবর্ষকে ফ্যাক্টারীতে পরিণত করাও সম্ভবপর হইবে না। কৃষি কার্য্য এ দেশের লোককে করিতেই হইবে এবং তাহারই ফাঁকে ফাঁকে অন্যান্য কাজের অবসরও তাহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া লইতে হইবে। এ অবসর সময়ের কাজ কল-কারখানা কখনও দিতে পারে না—দিতে পারে একমাত্র কুটির-শিল্প। সেই জন্য কুটির-শিল্পই এ দেশে বেকার-সমস্যা-সমাধানের সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী পথ। বস্তুতঃ কুটির-শিল্পের দ্বারা সমস্ত লোকের জীবিকার্জ্জনের সুযোগ কিছুদিন পূর্ব্বেও ভারতবর্ষে ছিল। তাঁতের শিল্প প্রায় ধ্বংস হইয়াছে। কিন্তু এই শিল্পটি এখনও ২০ লক্ষ লোকের অন্ন-বস্ত্রের রসদ যোগায়। অর্থাৎ ভারতবর্ষের সমস্তগুলি কল-কারখানা মিলিয়া যতগুলি লোককে পোষণ করিতেছে, একটি ধ্বংস-প্রায় কুটির-শিল্প এখনও তাহার প্রায় দেড়গুণ লোককে ভরণ-পোষণের সুযোগ দিতেছে।

কুটির-শিল্পগুলির ধ্বংসের দ্বারা দেশের ভিতর দুর্দ্দশার যে চেহারা জাগিয়া উঠিয়াছে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই, কুটির-শিল্প ছাড়া আমাদের যে বাঁচিবার আর পথ নাই, সে সম্বন্ধে সমস্ত সংশয় ও সন্দেহ দূর হইয়া যায়। এক একটি কুটির-শিল্পের আলোচনার দ্বারাই ইহার অন্তর্নিহিত শক্তি ধরা পড়ে। সূতা-কাটার শিল্পটি পূর্ব্বে ভারতবর্ষের সমস্ত মেয়ের অবসর সময়ের কাজ ছিল। এ দেশের মেয়েদের আত্মমর্য্যাদার যে আদর্শ ছিল তাহাতে বাহিরে পুরুষের সহিত একই সঙ্গে মিশিয়া তাহাদের কাজ করিবার সুযোগ ছিল না। অথচ সমাজের এমনি গড়ন ছিল যে, জাতির অর্দ্ধেক শক্তি যে বৃথা নষ্ট হইবে তাহারও উপায় ছিল না। তাহাদিগকে সূতা কাটিয়া জীবিকার্জ্জন করিতে হইত। এই উপায়ে তাহারা যে দশ-বিশ টাকা উপার্জ্জন করিত তাহাতে তাহাদের নিজেদের ভরণ-পোষণ সেই স্বচ্ছলতার দিনে বেশ ভালো ভাবেই চলিত। কিন্তু এই ব্যক্তিগত ভরণ-পোষণই ইহার একমাত্র সার্থকতা ছিল না। আজ প্রতি বৎসর অন্ততঃ ৬০ কোটি টাকা বস্ত্রের জন্য বিদেশে চলিয়া যায়। এই চরকার শিল্প সে টাকার বহির্গমন তো বন্ধ করিয়াই ছিল, উপরন্তু বিদেশ হইতে অর্থ আনিয়াও দেশকে সমৃদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। ভারতবর্ষের বস্ত্র-শিল্পের ইতিহাসের যে কোনো পৃষ্ঠার উপর দৃষ্টিপাত করিলে তাহা বোঝা যায়। অথচ এই প্রকাণ্ড বস্ত্র-শিল্পটি কুটির-শিল্প ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

আজ এই কুটির-শিল্পের স্থান বড় বড় মিল অধিকার করিয়া বসিতেছে। ইউরোপীয় যান্ত্রিক সভ্যতার মোহে আমরা এমনি অভিভূত যে, ইহার ফলে দেশের দুর্দ্দশা বাড়িতেছে কি কমিতেছে তাহাও তাকাইয়া দেখিবার

আমাদের অবকাশ নাই। Indian Tarriff Board on Cotton Textile Industry-র রিপোর্টে দেখা যায় ১০০০ টেকো চালাইতে বোম্বাই মিলে ২৪'২ জন লোক দরকার হয় এবং অন্যান্য প্রদেশে প্রয়োজন হয় ২৭'৬ জনের। অর্থাৎ একজন শ্রমিক বোম্বাই-এ ৪১টি এবং অন্যান্য প্রদেশে ৩৬টি টেকো চালাইবার ভার গ্রহণ করিতে পারে। মিলের একটি টেকোতে চরকার একটি টেকো অপেক্ষা প্রায় ছয়গুণ বেশী সূতা তৈরী হয়। সুতরাং এই হিসাব অনুসারে কাপড়ের কলের একজন শ্রমিক ২৪০ জন কাটুনীর অন্ন-সংগ্রহের পথ বন্ধ করিয়াছে। কাজের সাশ্রয় হিসাবে মিলের উপযোগিতা কেহই অস্বীকার করে না। কিন্তু কাজের অভাবে কোটি কোটি লোক যখন মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে তখন এ সাশ্রয়ের সার্থকতা কি ?

এই বস্ত্র-শিল্প সম্বন্ধে যে কথা খাটে, প্রায় সমস্ত কুটির-শিল্প সম্বন্ধেই সে কথা প্রয়োগ করা যায়। বস্ত্র-শিল্প যে ভাবে ধ্বংস হইয়া আজ লক্ষ লক্ষ লোকের জীবিকার্জ্জনের পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছে ঠিক তেমনি ভাবেই অন্যান্য কুটির-শিল্পগুলিও ধ্বংসের মুখে আগাইয়া চলিয়াছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার লোক কর্ম্মহীন হইয়া দিনের পর দিন অনশন ও অর্দ্ধাশনের জের টানিয়া চলিয়াছে। ঢেকিতে ধান ভানিয়া বা যাঁতায় গম পিষিয়া যাহারা জীবিকার্জ্জন করিত, চাল ও ময়দার কলের কল্যাণে তাঁহাদের অন্ন সংগ্রহের পথ আজ রুদ্ধ-প্রায়। ১৯২১ সালের হিসাবে দেখা যায়, ভারতবর্ষে ময়দা এবং চালের কলে মোটের উপর ৫০০০০ লোক কাজ করিয়াছে। এই কল প্রতিষ্ঠার ফলে কত জনের উপার্জ্জনের পথ বন্ধ হইয়াছে তাহার হিসাব আমি পাই নাই। কিন্তু যাঁহারা হিসাব জানেন তাঁহারা বলেন, কলের একজন শ্রমিক অন্ততঃ পক্ষে ১৫ জন ধান-কাঁড়ানী এবং যাঁতা-পেষণ-

কারীকে কর্ম্মচ্যুত করে। তাঁহাদের হিসাব ঠিক হইলে ১৯২১ সালে দুই দুটি কলের দৌলতে ৭ লক্ষ লোক যে কর্ম্মহীন হইয়াছিল তাহাতে নাই। কিন্তু এ ১৯২১ সালের কথা। আজ এই দুটি জিনিষের মিলের মজুরের সংখ্যা যে ৫০ হাজারের বেশী তাহা নিঃসঙ্কোচেই বলা যায়। এমনি ভাবে তেলের কল, দড়ির কল, রেশমের কারখানা প্রভৃতি লোককে তাহাদের ব্যবসা হইতে, জীবিকার্জ্জনের উপায় হইতে বঞ্চিত করিতেছে।

এই বাংলাতেই গুড়ের ব্যবসা একটা বড় ব্যবসা ছিল। কৃষকেরা তাহাদের কৃষিকার্য্যের অবসর সময়টা ইহাতে আত্মনিয়োগ করিয়া বেশ দুই পয়সা রোজগার করিত। কিন্তু চিনির কল প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আজ তাহাদের সে রোজগারের পথটাও রুদ্ধ-প্রায়। শোনা যায়—চিনি হইতে গুড় স্বাস্থ্যের পক্ষে বেশী উপকারী। কিন্তু চিনির শুভ্রতার মোহের প্রভাব আমাদের বিলাসী মনের উপর ঢের বেশী। তাই গুড় আর আমাদের মুখে রোচে না। ফলে বিদেশী চিনি আজ দেশের শোষণের একটা বড় রাস্তা খুলিয়া বসিয়াছে।

এলুমিনিয়ম, এনামেলের বাসন-পত্র আসিয়া দেশের পিতল-কাঁসার কারিকরদের অন্ন মারিয়াছে। দা, কোদাল, কুঠার, লাঙ্গলের ফলা এগুলি পূর্ব্বে কামারের দোকানে তৈরী হইত, আজ এ সব জিনিষের আমদানী করা হয় বিদেশের কারখানা হইতে। ফলে দেশে আজ আর কামারের সন্ধান পাওয়া যায় না। চামড়ার ব্যবসায়ীদের সম্বন্ধেও সেই কথা। মেয়েদের সিন্দুর, শাঁখা, চুড়ি—এ সমস্ত জিনিষও পর্য্যন্ত আর দেশে হইবার জো নাই। কারখানার চাপে পড়িয়া যাহারা এ সব তৈরী

কৰিত তাহারা আজ অন্নহীন, কর্ম্মহীন, বুভুক্ষু বেকারের দলে পরিণত।

কল-কারখানা সেই সব দেশেই বাড়িয়া উঠিতে পারে, যে সব দেশের প্রকৃতি স্বাভাবিক ভাবে মানুষকে কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা করে না। জীবিকার্জ্জনের জন্য সেই সব দেশেই অত্যন্ত কৃত্রিম পদ্ধতিসমূহ অবলম্বন করিতে হয়। নিজেদের প্রয়োজনাতিরিক্ত পণ্য তৈরী করিয়া তাহাই বিক্রয়ের দ্বারা তাহারা জীবিকার্জ্জনের পথ খুঁজিয়া লয়। তাহাদের এই পথ খুঁজিয়া লওয়ার ভিতরেও বৈচিত্র্য আছে। সঙ্গীনের খোচা উদ্যত করিয়াই দুর্ব্বল ব অল্প-শক্তির লোকদের ভিতর তাহাদের কেনা-বেচার কারবার চলে।

ভারতবর্ষেও একদল লোক আছেন যাঁহারা বলেন—মিলে যদি বেশী জিনিষ তৈরী হয়, তবে সে জন্যই বা এত ব্যস্ত হইবার কারণ কি প্রয়োজনাতিরিক্ত জিনিষটা বিদেশে বিক্রয় করিয়াই ভারত সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিবে। বিরাট কারখানা ফাঁদিয়া বসিতে পারিলে পণ্য প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রস্তুত হইতে পারিবে সন্দেহ নাই—কিন্তু সেগুলি বিকাইবার বাজার খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে কোথায়? ইউরোপের জাতিগুলির মতো সঙ্গীনের খোচা উদ্যত করিয়া পণ্য বিক্রয়ের বাজার জিনিয়া লইবার শক্তি ভারতবর্ষের নাই—থাকিলেও মানবতার দিক দিয়া তাহার প্রয়োগ-পন্থা হইতে পারে না। গত একশত বৎসরের ভিতর যতগুলি যুদ্ধ হইয়াছে তাহার শতকরা ৯৯টিই পণ্য বিক্রয়ের বিধি-ব্যবস্থার ব্যাপার লইয়া। সুতরাং দুর্ব্বল ভারতের পক্ষে বিদেশে পণ্য পাঠাইয়া লাভবান হইবার আশা যে দুরাশা মাত্র তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তাহা ছাড়া পাশ্চাত্য ব্যবসা-বাণিজ্যের রাজ্যে প্রতিযোগিতার যে হিড়িক আজ জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহার তাল সামলাইয়া

লইয়া পাশ্চাত্য ধরণের কল-কারখানার প্রতিষ্ঠার দ্বারাও ভারতবাসীর ঐশ্বর্য্য বাড়াইবার শক্তি হইবে না। ইংলণ্ড আজ দেড়শত বৎসর ধরিয়া কলের দানবকে অর্ঘ্যের পর অর্ঘ্য যোগাইয়া আসিতেছে। এই দীর্ঘ কাল আরাধনার পরেও আমেরিকা ও জার্ম্মাণী তাহার অবস্থা গত ৫০ বৎসরের চেষ্টায় যেরূপ শোচনীয় করিয়া তুলিয়াছে, তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও ও-পথ যে আমাদের পথ নহে তাহা ধরা পড়ে। তবু যদি শাসন দণ্ড আমাদের হাতে থাকিত তবে বিদেশী দ্রব্যের আমদানীকে আইনের বলে বন্ধ করিয়া আমরা হয়তো আমাদের শিশু-শিল্প গুলিকে বাঁচাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিতে পারিতাম। কিন্তু সে পথও যখন খোলা নাই তখন এই দুরাশার সমুদ্রের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িলে দুঃখ ছাড়া যে আর কোনো লাভ হইবে না তাহা সুনিশ্চিত।

সুতরাং ভারতবর্ষের পক্ষে সেই পথই একমাত্র পথ, যে পথ কর্ম্মের সংক্ষেপ করে না, বরং সকলকেই কাজ দিয়া তাহাদের জীবিকার্জ্জনের সুবিধা প্রদান করে। এই জন্যই কল-কারখানার প্রতিষ্ঠায় ভারতের কল্যাণের যতখানি আশা করা যায় তাহা অপেক্ষা ঢের বেশী আশা করা যায় গৃহ-শিল্পের প্রতিষ্ঠায়। পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহের কাজল আমাদের চোখের দৃষ্টির স্বচ্ছতা ঢাকিয়া না দিলে একথা আমরা সহজেই বুঝিতে পারিতাম; কিন্তু দৃষ্টি আমাদের স্বাভাবিক অবস্থায় নাই। তাই দেশের মনে এ অনুভূতি জাগানোও সহজ হইবে না। বস্তুতঃ দেশের চিন্তার ধারার পরিবর্ত্তনের উপরেই ইহার সাফল্য নির্ভর করে। এজন্য সর্ব্বাগ্রে ইউরোপের দিক হইতে আমাদের দৃষ্টি ফিরাইয়া আনা দরকার। আজ দেশের যাঁহারা কর্ম্মিনা করেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের সেই চেষ্টা করাই উচিত, যাহাতে

দেশের শিক্ষিত সমাজের এবং জন-সাধারণের মন গৃহ-শিল্পগুলির ক্ষেত্র, ভবিষ্যৎ ও সুবিধা ইত্যাদি সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠে।

আজ কলের ধোঁয়ায় ভারতবর্ষ পথ দেখিতে পাইতেছে না সত্য, কিন্তু এই ধোঁয়ার মোহ যদি একবার কাটিয়া যায়, দেশের লোক কুটির-শিল্পের সহজ সরল অনাড়ম্বর আবহাওয়ায় বসিয়া আবার যদি কাজ আরম্ভ করিতে পারে তবে দেশের অন্ন-বস্ত্রের দুঃখতো দূর হইবেই, তখন ইহার স্বাধীনতা দ্বারও আর অর্গল-রুদ্ধ থাকিবে না। ভারতের শোষণের জন্যই দুনিয়ার চোখ ভারতের উপর পড়িয়া আছে। কুটির-শিল্পের প্রতিষ্ঠার দ্বারা যদি এই শোষণের পথ বন্ধ করা যায়, তবে ইহার প্রতি বিদেশীদের যে অহেতুক মমতা আজ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে তাহার উচ্ছ্বাসও কমিয়া আসিবে। সকলেই জানে—কামধেনুকে দোহন করিবার জন্যই তাহার গলায় বন্ধন-রজ্জুর ফাঁস পরাইয়া দেওয়া হয়, তাঁহার উপকার বা কল্যাণের অনুপ্রেরণা তাহাকে বাঁধিয়া রাখিবার কারণ নহে।